Tinni O Bonya by Md. Jafar Iqbal

For More Books & Music Visit www.banglaeye.com.com

nijhumdip@yahoo.com

তিন্নি ও বন্যা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

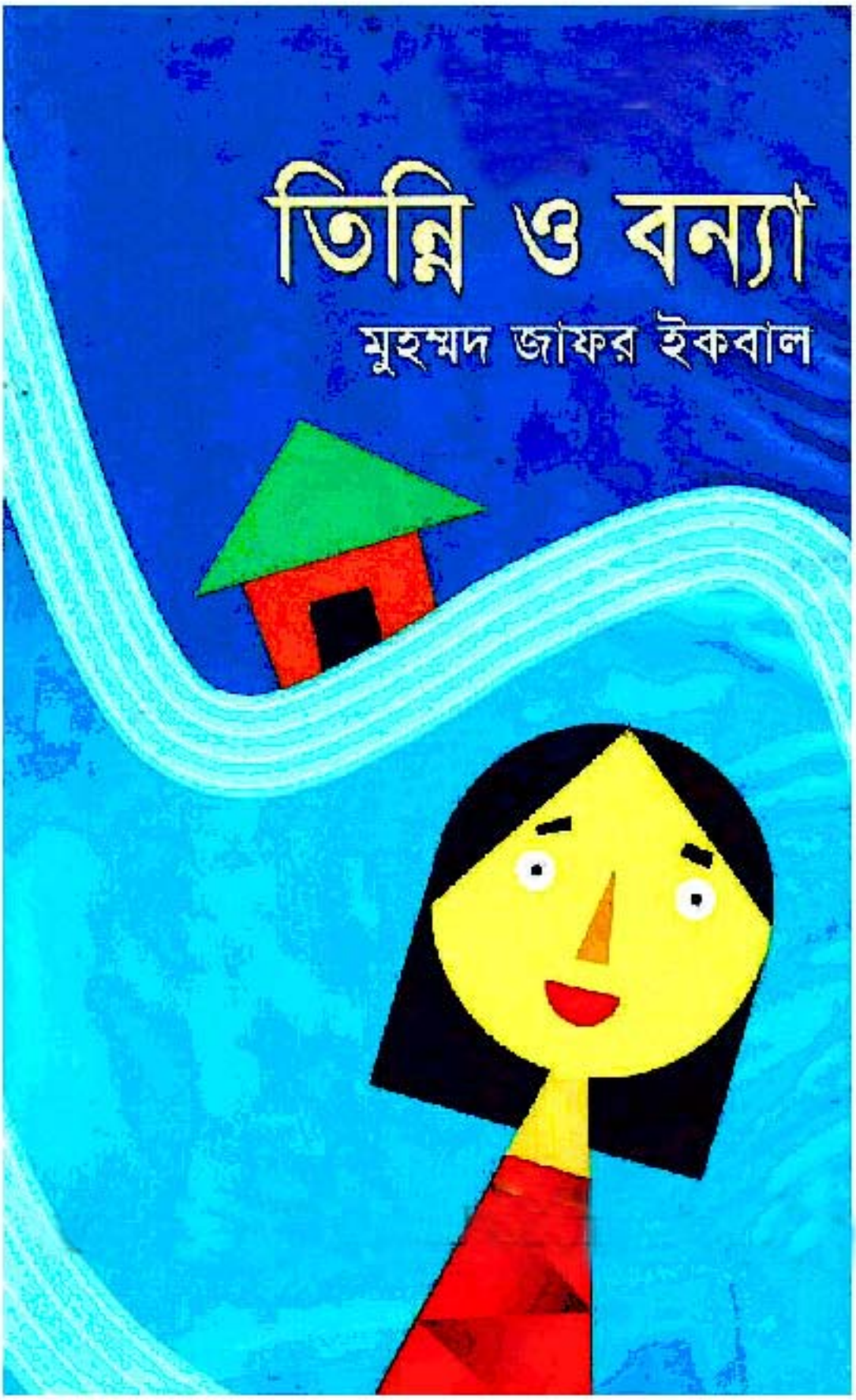

সূচি

ঝুম্পু	৭
গ্রাউল	১৮
শকসো	২৬
ফ্রাণী	৪২
হেঁচকি	৫৪
নূপুর	৬২
তিন্নি ও বন্যা	৭৬

ঝুম্পু

ফাইনাল পরীক্ষার শেষে সিলেট থেকে ঝুমুর আমাকে চিঠি লিখল, চিঠির বিষয়বস্তু এরকম : অনেকদিন আমাকে দেখে না, আমি কি আগের মতোই বেকুব আছি, নাকি কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে সেটা দেখার তার কৌতূহল। তাই পরীক্ষা শেষ হবার পরই আমি যেন সিলেট চলে আসি।

ঝুমুর আমার ছোট খালার মেয়ে, বয়সে আমার থেকে বছর দুয়েক বড় হতে পারে, কিন্তু কথাবার্তা খুব চ্যাটাং চ্যাটাং। তাকে দেখে মনে হয় কেউ বুঝি একটা শুকনো কাঠির মাঝে আলু গেঁথে দিয়েছে। তার ছোটজনের নাম বাবু যদিও তার চেহারার মাঝে কোনো বাবুয়ানার চিহ্ন নেই—গাবদা-গোবদা বোকা-বোকা চেহারা।

পরীক্ষা শেষ হলে সবাই কতরকম আনন্দ করে—নাটক-সিনেমা দেখে, গিটার বাজানো শেখে, হৈচৈ করে ক্রিকেট খেলে, কেউ-কেউ আবার কক্সবাজার রাঙামাটি বেড়াতে যায়। আমি কখনো কিছু করি নি, তাই ঝুমুরের চিঠি পেয়ে এবারে আমি ঠিক করে ফেললাম যে-করেই হোক সিলেট যেতে হবে। আব্বা-আম্মার পিছনে ঘ্যানঘ্যান করে জ্বালাতন শুরু করলাম। আমার ঘ্যানঘ্যান করার কাজ হল বলা যেতে পারে, একরকম বিরক্ত হয়েই আব্বার পরিচিত এক বন্ধুর সাথে আমাকে সিলেটে খালার বাসায় পাঠিয়ে দিলেন।

আমি যখন ছোট খালার বাসায় পৌঁছালাম তখন সন্ধে হয়ে গেছে। দরজা খুলে দিল ছোট্ট পরীর মতো দেখতে খুব সুন্দর চেহারার একটা মেয়ে। আমাকে দেখে চিৎকার করে বলল, "এসে গেছে! এসে গেছে!! রাঘু এসে গেছে! পিপীলিকাভুক রাঘু!"

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন নাকি মাঝে মাঝে পিঁপড়া মেরে খেতাম—সেজন্যে কেউ-কেউ আমাকে পিপীলিকাভুক রাজু ডাকে, কিন্তু এই মেয়েটি কেমন করে আমার এই নামটা জানল! আমি অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকালাম এবং হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম সে ঝুমুর! ছোট খালার বড় মেয়ে যাকে এই কয়দিন আগেও দেখাত একটা কাঠির মাথে গেঁথে-রাখা আলু। আমি অবাক হয়ে বললাম, "ঝুমুর! তুমি?"

ঝুমুর চোখ পাকিয়ে বলল, "ঝুমুর কী রে? আমি তোর বড় না? বল ঝুমুর আপু—"

আমি বললাম, "ঝুমুর আপু? তুমি—তুমি—"

"আমি কী?"

"তুমি দেখতে ভালো হয়ে গেছ!"

ঝুমুর আপু খপ করে আমার চুলের গোছা ধরে বলল, "তার মানে তুই বলতে চাস আমি আগে দেখতে ভালো ছিলাম না?"

আমি নিজেকে কোনোভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, "ছিলে না তো! আগে দেখতে ছিলে একটা ঝাড়ুর কাঠির আগায় একটা আলু—"

"দেব একটা থাবড়া—" বলে ঝুমুর আপু সত্যি সত্যি থাবড়া দেওয়ার জন্যে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু তার আগেই আমাদের চ্যাচামেচি হৈচৈ শুনে ছোট খালা ছোট খালু হাজির হলেন, পিছুপিছু বাবুও এসে হাজির হল। আমি সালাম করলাম, ব্যাগ রেখে মায়ের চিঠিপত্র পার মিষ্টির বাক্স বের করে দিলাম, অনেক দিন পর দেখা হলে সবার যেরকম আহ্য উহু করার কথা সেসব করা শুরু হল।

গোসল খাওয়া সবকিছু সেরে রাতে আমরা বাচ্চারা গল্প করতে বসেছি। ঝুমুর আপু এবারে ক্লাস নাইনে উঠবে, কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় সে বুঝি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে গেছে। কথাবার্তায় খুব তেজ, আমাকে জিজ্ঞেস করল, "কয়দিন থাকবি, নাকি আম্মু আম্মু করে কেঁদে ভাসাবি?"

আমি ঘাড় শক্ত করে বললাম, "কী বল তুমি! একশোবার থাকব।"

"গুড। কয়দিন থাক, অনেক মজা করব আমরা। আমি একটা দল খুলেছি, সেটার মেম্বার করে দেব তোকে।"

"কিসের দল?"

"নাম দিয়েছি কুদূদ।"

"কুদূদ? এটা আবার কীরকম নাম?"

"কুসংস্কার দূরীকরণ দল। সংক্ষেপে কুদূদ। সব কুসংস্কার দূর করে ফেলব একে একে। একটা খাতা কিনে সেখানে কুসংস্কারের লিস্ট করা শুরু করেছি। দুইশো নয়টা লেখা হয়েছে।"

==========

"দূর হয়েছে কয়টা?"

"সাতাশটার মতো। তুই এসেছিস এখন তোকে দিয়ে কাল আটাশ নম্বরটা ট্রাই করব।"

"সেটা কী?"

"পিঁপড়া খেলে নাকি মানুষ সাঁতার শেখে। কাল দুই-এক ডজন পিঁপড়া খেয়ে পানিতে লাফ দিবি।"

"আমি কেন?"

"আর কে পিঁপড়া খেতে রাজি হবে? মনে নেই তুই ছোট থাকতে কিল মেরে পিঁপড়াকে আধমরা করে টপ করে খেয়ে নিতি?"

"ছোট থাকতে মানুষ তো কত কীই করে—কাপড়ে পেশাব করে দেয়! তাই বলে—"

কথা শেষ করার আগেই ঝুমুর আপু আবার আমার চুলের গোছা ধরে ফেলল।

ঝুমুর আপুর এই ধরনের শারীরিক নির্যাতনের পরেও ছোট খালার বাসায় আমার খুব চমৎকার সময় কাটতে লাগল। পরীক্ষা শেষ, পড়াশোনার চিন্তা নেই—যা ইচ্ছে তা-ই করা যায়। ঝুমুর আপু আগেও একটু পাগলাটে ধরনের ছিল, এখন পাগলামো আরও বেড়ে গেছে। বাবু তাকে ঝুম্পু বলে ডাকে। প্রথমবার শুনে আমি অবাক হয়ে বললাম, "ঝুম্পু? সেটা আবার কী?"

বাবু দাঁত বের করে হেসে বলল, "ঝুমুর নামের আপু—ঝুম্পু। মধ্যপদলোপী তৎপুরুষ।"

বাবুর দেখাদেখি আমিও ঝুমুর আপুকে ঝুম্পু নামে ডাকতে শুরু করলাম, প্রথম প্রথম চোখ পাকিয়ে তাকালেও শেষে মেনে নিল।

সিলেট শহরের আশেপাশে বেড়ানোর জন্যে অনেক রকম মজার মজার জায়গা আছে। টিলা, চা-বাগান, ঝরনা, বিশাল হাওর। বেড়াতে এসেছি বলে ছোট খালু সব জায়গায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। মাইক্রোবাসে করে যাই, সাথে থাকে খাওয়ার প্যাকেট, পানির বোতল, মাথায় টুপি, পকেটে ক্যামেরা—একেবারে স্ফূর্তির ফাটাফাটি অবস্থা।

মনে হয় সব ভালো জিনিসেরই শেষ থাকে, আমাদের এই ঘুরে বেড়ানোর আনন্দেরও শেষ ঘনিয়ে এল। একদিন ভোরবেলা জামশেদ মামা এসে হাজির হলেন।

==========

জামশেদ মামা হচ্ছেন আমার মায়ের চাচাতো ভাই, পৃথিবীতে তাঁর থেকে নীরস খুঁতখুঁতে এবং খিটখিটে মেজাজের আর কোনো মানুষ আছে বলে আমার জানা নেই। জামশেদ মামা পৃথিবীর একটি জিনিসকেও এখন পর্যন্ত ভালো বলেন নি, সবকিছুর মাঝেই তিনি কোনো-না-কোনো দোষ খুঁজে পান। আমি একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি জামশেদ মামার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে দেখা হলে ভুরু কুঁচকে বলতেন, "রবীন্দ্রনাথ সাহেব, সোনার বাংলা গানটা কীরকম একটা গান হল? জাতীয় সঙ্গীতের জন্যে আরও ভালের একটা গান লিখতে পারলেন না?" বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হলে বলতেন, "সাতই মার্চের ভাষণটা বেশি সুবিধের হয় নাই, গ্রামারে গোলমাল আছে।" শুধু তা-ই না, হাসরের ময়দানেও নিশ্চয়ই খোদাকে বলে বসবেন, "খোদা, পৃথিবীটাকে গোল না করে যদি চ্যাপটা করে তৈরি করতে মনে হয় ভালো হত!"

এই হচ্ছে আমাদের জামশেদ মামা। সব সময় নাক চোখ মুখ কুঁচকে রেখেছেন। যেটাই দেখছেন সেটা দেখেই বিরক্ত হচ্ছেন এবং রেগে যাচ্ছেন। শুধু এটা হলে আমাদের কোনো অসুবিধে ছিল না, কিন্তু আমাদের বিপদ এল অন্যদিক দিয়ে। আমরা যখন নানা জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি তখন সাথে একজন বড় মানুষ হিসেবে জামশেদ মামাকে জুড়ে দেওয়া শুরু হল। ঘুরে বেড়ানোর পুরো আনন্দটা মাটি হয়ে গেল আমাদের।

একদিন আমরা জাফলং বেরাতে গেলাম, সিলেট শহর থেকে দুই ঘণ্টার রাস্তা। জামশেদ মামা সাথে থাকবেন বলে আমরা যেতেই চাচ্ছিলাম না, কিন্তু পরে শুনলাম জায়গাটা খুব সুন্দর, একেবারে বর্ডারের কাছে, পাহাড়ি ঝরনা আর নদী। সব শুনে শেষ পর্যন্ত আমরা যেতে রাজি হলাম।

মাইক্রোবাস যাচ্ছে, আমি, ঝুম্পু আর বাবু পিছনে বসে রাস্তার মানুষগুলিকে নিয়ে একটা খেলা আবিষ্কার করছি তখন জামশেদ মামা মনে হয় সময় কাটানোর জন্যে আমাদের সাথে কথা বলা শুরু করলেন। আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই ইয়ে তোমার নাম যেন কী?"

মামা সব সময় ভান করেন আমাদের মতো তুচ্ছ মানুষদের নাম তাঁর মনে থাকে না। আমি বললাম, "রাজু।"

"অ। কোন ক্লাসে পড়?"

এটাও আগে বলা হয়েছে, তবু আবার বলালাম, "ক্লাস এইটে উঠব।"

মামা নাক কোঁচকালেন যেন আমার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়েছে, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "এত বড় ধামড়া ছেলে ক্লাস এইটে? আমি তোমার বয়সে এস. এস. সি. দিয়েছি।"

==========

রাগে আমার পিত্তি জ্বলে গেল, ছোট থাকতে একটা ডাবল প্রমোশান পেয়েছিলাম বলে বয়স অনুযায়ী আমি এক ক্লাস উপরে। কিন্তু মামাকে সেই কথা বলার ইচ্ছাও হল না। জামশেদ মামা এবারে উদাস চোখে ঝুম্পুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কোন ক্লাসে?"

ঝুম্পু প্রথমে না শোনার ভান করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। মামা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতেই সে এক ক্লাস বাড়িয়ে বলল, "ক্লাস টেনে।"

মামা ভুরু কুঁচকে বললেন, "সেদিন যে বললে ক্লাস নাইন?"

ঝুম্পু দাঁত বের করে হাসার ভান করে বলল, "দেখছিলাম আপনার মনে আছে কি না।"

মামা খোঁচাটাকে সহজভাবে নিলেন না। খানিকক্ষণ চোখ কুঁচকে ঝুম্পুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের স্কুলে আজকাল পড়াশোনা হয়?"

ঝুম্পু ঘাড় বাঁকা করে বলল, "হয়।"

"কী পড়ায়?"

"ইংরেজি বাংলা অঙ্ক এইসব।"

জামশেদ মামা ঠোঁটটা একটু কোঁচকালেন। মামার চেহারাটা মনে হয় খারাপ না, কিন্তু আমরা তাঁকে দুচোখে দেখতে পারি না বলে তাঁকে দেখতে আমাদের কাছে বিচ্ছিরি লাগে। ফরসা তেলতেলে মুখ, নাকের নিচে লালচে গোঁফ, মোটা ঠোঁটের আড়ালে কালচে জিব। মামা জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন, "আজকাল কি আর স্কুলে পড়াশোনা হয়? আমাদের সময় যারা এস. এস. সি.-তে ফেল করত তারাও আজকালকার বি. এ. এম. এ. থেকে বেশি ইংরেজি জানত।"

ঝুম্পু বুঝে ফেলার ভান করে বলল, "তা তো হতেই পারে। তখন ব্রিটিশরা শাসন করত, ইংরেজির উপর জোর ছিল অনেক বেশি।"

জামশেদ মামা একটু রেগে উঠে বললেন, "ব্রিটিশরা ছিল ফর্টি সেভেনের আগে। তোমাদের ইতিহাস পড়ায় না?"

"পড়ায়।" ঝুম্পু চোখেমুখে একটা উদাস ভাব ফুটিয়ে বলল, "আমি ভেবেছিলাম আপনি ব্রিটিশ আমলের মানুষ। অনেক বয়স্ক দেখায় তো!"

মামা এবারে মুখ ভোঁতা করে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখে হাত বুলালেন, গোঁফে হাত বুলালেন, চুল টেনে দেখলেন—মনে হয় সত্যি তাঁকে এত বুড়ো দেখাচ্ছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। শেষে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "এই দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দেশটা আস্তে আস্তে ডুবে যাবে।"

www.banglaeye.com

www.banglaeye.com

ঝুম্পু ঘাড় বাঁকা করে জিজ্ঞেস করল, "কিসে ডুবে যাবে?"

মামা উত্তর দেওয়ার আগেই বাবু তার চিপসের প্যাকেট থেকে এক খাবলা চিপস মুখে দিয়ে বলল, "বন্যার পানিতে। তা-ই না মামা?"

মামা খুব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "না। দেশ ডুবে যাবে গুণ্ডামিতে আর চুরি-ডাকাতিতে।"

ঝুম্পু আবার ঘাড় বাঁকা করে বলল, "আপনাদের সময় দেশে চোর-গুণ্ডা ছিল না? শুধু ছোট ছোট মহাপুরুষেরা ছিল?"

মামা গলার স্বর মোটা করে অনেকটা বাংলা নাটকের নায়কদের মতো গলা করে বললেন, "আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময়ের মানুষ। আমাদের মতো দেশপ্রেম, ত্যাগ—"

ঝুম্পু ঝট করে ঘুরে বলল, "আপনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?"

মামা আমতা-আমতা করে বললেন, "সেই সময় সবাই ছিল মুক্তিযোদ্ধা।"

"কিন্তু আপনি কী ছিলেন? ট্রেনিং নিয়ে এসে যুদ্ধ করেছেন?"

"ইয়ে মানে—"

বাবু মুখে আরও এক খাবলা চিপস পুরে দিয়ে কড়মড় করে খেতে খেতে বলল, "নিশ্চয় ছিলেন। দেখছ না মামার মিলিটারিদের মতো মোচ। তা-ই না মামা?"

মামা দুর্বলভাবে মাথা নাড়লেন। ঝুম্পু তখন সোজা হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কত নম্বর সেক্টরে ছিলেন?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার কমান্ডার কে ছিল?"

বাবু জিজ্ঞেস করল, "আপনার মেশিনগান আছে মামা?"

জামশেদ মামার মুখ কালো হয়ে উঠল, চোখ লাল হয়ে উঠল। নাক মোটা করে হঠাৎ বাজখাঁই একটা ধমক দিয়ে বললেন, "আমার সাথে ফাজলেমি? একেবারে কান ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেব।"

ঝুম্পু হঠাৎ মরিয়া হয়ে বলল, "কিন্তু আপনি কি সত্যিই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?"

রাগে মামার চেহারা খারাপ হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, "ছিলাম।"

"সত্যি?"

মামা চিৎকার করে বললেন, "আমি কি মিথ্যা কথা বলছি? আমি কি তোদের সাথে মশকরা করব? তোদের মতো আমরা কি নীতিহীন মানুষ? পাজি আর বেয়াদপ? আমরা কি ফাজিল ইতর ছোটলোক?"

==========

মামা খুব খারাপভাবে গালিগালাজ করতে লাগলেন। ভাগ্যিস গাড়ি চলছে, নাহয় গাড়ি ঘিরে মানুষের ভিড় জমে যেত। মামার এরকম গালিগালাজ শুনে ঝুম্পু এবং আমরা চুপ মেরে গেলাম।

জাফলং ভ্রমণটা আমাদের একেবারে মাটি হল। আমরা রওনা দিয়েছি দেরি করে, পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক দেরি হল। জায়গাটার সৌন্দর্যের অনেক বর্ণনা শুনেছি, কিন্তু গিয়ে দেখি শত শত ট্রাক পাথর তুলে আনছে, নদীতে নৌকার ভিড়, সেখানে হাজার হাজার মানুষ নদী থেকে ছেঁকে ছেঁকে বালু বের করছে। নদীতীরে ছোট ছোট দোকান, সেখানে স্মাগল করে আনা জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে।

জামশেদ মামাকে দেখলাম স্মাগল করে আনা জিনিসে খুব শখ, দোকান থেকে দোকান ঘুরে ঘুরে আফটার শেভ লোশান সাবান এইসব জিনিস খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন।

আমরা ফিরে যাওয়ার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছিলাম, কিন্তু জামশেদ মামার জন্যে খুব দেরি হল। যখন রওনা দিয়েছি তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। মাইক্রোবাসে আমরা চুপ করে বসে আছি, বাইরে অন্ধকার, সরু রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। মামা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন তাঁর সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। সামনে কিছু দোকানপাট দেখে সেখানে গাড়ি থামানো হল, মামার সাথে আমরাও নামলাম। মামা সিগারেট কিনলেন, আমি কিনলাম চিউয়িংগাম, তখন একজন জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি বেড়াতে এসেছ?"

আমরা মাথা নাড়লাম। মানুষটা বলল, "তোমারা কি রানি ইরাবতীর বেদি দেখেছ?"

"না।" ঝুম্পু জিজ্ঞেস করল, "কী আছে সেখানে?"

"নরবলি হত সেখানে।"

"নরবলি?" আমি শিউরে উঠে বললাম, "সর্বনাশ!"

জামশেদ মামা শুকনো গলায় বললেন, "কখন হত?"

"এই শতাব্দীতেও হয়েছে। খাসিয়া রানি ছিল ইরাবতী।"

'নরবলি দিত কেন?"

"রানির খেয়াল। অপরাধীদের শাস্তি দিত সেটাও বলে কেউ-কেউ।"

ঝুম্পু বলল, "চলো জায়গাটা দেখে যাই।"

মানুষটা মাথা নেড়ে বলল, "আজকে রাত হয়ে গেছে। না যাওয়াই ভালো। তার উপর কৃষ্ণপক্ষের রাত।"

"কেন?"

==========

"জায়গাটা খারাপ। অন্ধকারে যাওয়া ঠিক না।"

ঝুম্পু কৌতূহলী মুখে বলল, "কী হয় গেলে?"

"ভয় পায়। অনেক নরবলি হয়েছে তো—কিছু-একটা আছে। বিশেষ করে মেয়েদের যাওয়া একেবারেই ঠিক না। রানি ইরাবতীর প্রেতাত্মা নাকি ঘুরে বেড়ায়।"

শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, দেখলাম জামশেদ মামাও কেমন জানি শিটিয়ে উঠলেন, শুকনো গলায় বললেন, "দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল বাসায় যেতে হবে।"

ঝুম্পু ঘাড় বাঁকা করে বলল, "আমি রানি ইরাবতীর বেদি না দেখে যাব না।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কী বলছ তুমি ঝুম্পু? এত রাতে?"

"রাতই তো ভালো।"

জামশেদ মামা দুর্বল গলায় একটা হুংকার দিলেন, "বাসায় চল।"

ঝুম্পু ততক্ষণে মানুষটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রানি ইরাবতীর নরবলির বেদির খোঁজ নিয়ে সেদিকে হাঁটতে শুরু করেছে। আমি পিছুপিছু ছুটে গিয়ে বললাম, "কী পাগলামি করছ ঝুম্পু?"

ঝুম্পু মুখ শক্ত করে বলল, "আমি হচ্ছি কুদ্দুসের চেয়ারপারসন—এইসব কুসংস্কার বিশ্বাস করি না। তোরা যেতে চাইলে আয় নাহয় আমি একলাই যাব।"

বাবু মুখ কাঁদোকাঁদো করে বলল, "যেও না ঝুম্পু।"

ঝুম্পু কারও কথা শুনল না, অন্ধকার পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। বাধ্য হয়ে আমরাও পিছুপিছু হাঁটতে থাকলাম। জামশেদ মামা কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছেন, নিচু গলায় গজগজ করছেন। আমি বললাম, "ভূত তো আর সত্যি নেই—এটা নিশ্চয়ই বানানো—"

"বানানো না হাতি! এরকম জিনিস কেউ বানিয়ে বলে?"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "তা হলে এটা কি সত্যি?"

"নিশ্চয়ই সত্যি। আমার ছোট ফুপু চুল খোলা রেখে বাঁশঝাড়ে গিয়েছিল। তখন—"

বাবু কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, "এখন বলবেন না মামা, ভয় করছে।"

মামা চুপ করে গেলেন।

রানি ইরাবতীর বেদিটা একটা দেওয়ালে ঘেরা জায়গার ভিতরে। বাইরে বিশাল কিছু চ্যাপটা ধরনের পাথর সাজানো আছে, দেখে মনে হয় অনেক মানুষ সেখানে বসে থাকত। পিছনে পাথরের দেওয়াল উঁচু করে রাখা।

==========

সামনে একটা সরু গেট, সেটার ভিতর দিয়ে ভিতরে ঢুকেছি। ভিতরে আবছা অন্ধকার, সামনে অনেকটা জায়গা খালি একটা খোলা মাঠের মতো। তার সামনে একটা বড় গোলাকার পাথরের বেদি। এখানে নিশ্চয়ই মানুষকে এনে বলি দিত, জায়গাটা দেখেই আমার ভিতরে আতঙ্কের একটা শিহরন বয়ে গেল।

ঝুম্পু বেদিটা স্পর্শ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ এক লাফে বেদিটার উপরে উঠে দাঁড়ায়। জামশেদ মামা ভয়-পাওয়া গলায় বললেন, "এই ঝুমুর, ওখানে উঠেছিস কেন? নাম। নাম বলছি!"

ঝুম্পু বেদি থেকে নামল না। হেঁটে হেঁটে ঠিক মাঝখানে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। আমরা আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলাম সে আকাশের দিকে মুখ করে তাকিয়েছে, তারপর হঠাৎ মাথার ফিতা টান দিয়ে চুলগুলি খুলে দিল। জামশেদ মামা শুকনো গলায় বললেন, "চুল খুলছে কেন? চুল—"

আমার হঠাৎ একধরনের ভয় হতে থাকে। আমি কাঁপা গলায় বললাম, "ঝুম্পু—এই ঝুম্পু!"

ঝুম্পু আমার কথার উত্তর দিল না। বাবু কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, "এই ঝুমুর আপু! কথা বল না কেন? আমার ভয় করছে।"

ঝুম্পু হঠাৎ অমানুষিক একধরনের গলায় খিলখিল করে হেসে ওঠে—আমরা সেই হাসি শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। জামশেদ মামা কাঁপতে কাঁপতে পকেট থেকে একটা ম্যাচ বের করে একটা কাঠি জ্বালানোর চেষ্টা করতেই ঝুম্পু চিলের মতো চিৎকার করে বলল, "না। খবরদার!" তারপর বিজাতীয় একধরনের আঞ্চলিক সুরে কী যেন বলতে বলতে মামার দিকে এগিয়ে আসে। মামার কাছাকাছি এসে হঠাৎ ঝুম্পু থেমে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, "রক্ত চাই।"

আমরা কোনো কথা বললাম না। ঝুম্পু আবার বলল, "রক্ত। রক্ত চাই। কতদিনের তৃষ্ণা আমার। দাও রক্ত দাও—"

ঝুম্পু তার চুল ছড়িয়ে বেদির উপরে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "রক্ত। রক্ত।"

আমি শুকনো গলায় বললাম, "কে? তুমি কে?"

ঝুম্পু খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "তুমি আমাকে চেন না? আমি রানি ইরাবতী।"

"ই-ই-ইরাবতী?"

"হ্যাঁ। আমার ডাকে তোমরা এসেছ এখানে। আমার রক্ত চাই। রক্ত।"

আমি ভাঙা গলায় বললাম, "কার রক্ত?"

==========

"তোমাদের মাঝে যে মিথ্যাবাদী তার রক্ত। আসো, কাছে আসো। আমি গলায় কামড় দিয়ে শিরা ছিঁড়ে নেব—"

ঝুম্পুর মুখ থেকে হঠাৎ রক্ত শুষে নেবার শব্দ শোনা গেল, আমার সমস্ত শরীর জমে যায় আতঙ্কে। আমি ভয়ে মাথা নেড়ে বললাম, আমি না। আমি না—আমি মিথ্যা কথা বলি নাই—"

"কে বলেছ?" ঝুম্পুর গলা দিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা মেয়ের গলায় কে যেন চিৎকার করে উঠল, "কে বলেছে?"

জামশেদ মামা হঠাৎ ঝুপ করে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলেন। ভাঙা গলায় বললেন, "ক্ষমা চাই। ক্ষমা চাই রানি ইরাবতী। আমি মিথ্যা কথা বলেছি। আমি—"

"কী বলেছ তুমি?"

"আমি বলেছি আমি মুক্তিবাহিনী, আসলে—আসলে—"

ঝুম্পু হঠাৎ মুখ তুলে হিংস্র গলায় বলল, "আসলে কী?"

"আসলে আমি মুক্তিবাহিনী না। আমি ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করেছি—"

ঝুম্পুর শরীরে রানি ইরাবতীর দেহ টানটান হয়ে দাঁড়াল। দুই হাত উপরে তুলে কী-একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে একেবারে স্বাভাবিক গলায় বলল, "কুদূদের আটাশ নম্বর কুসংস্কার ভুল প্রমাণিত হল।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কী? কী বললে?"

ঝুম্পু এক লাফে বেদি থেকে নেমে বলল, "এখানে মেয়েরা এলে তার উপর রানির প্রেতাত্মার বশ হয় সেটা পুরোপুরি গুলপট্টি।"

আমি তখনও বুঝতে পারছিলাম না—কোনোমতে বললাম, "ঝুম্পু! তুমি ঠিক আছ?"

"ঠিক থাকব না কেন? আমাদের স্কুলে রানি ইরাবতী নাটক হয়েছিল, সেখান থেকে অ্যাকটিং করে দেখালাম। ভালো হয়েছে না? গোল্ড মেডেল পেয়েছিলাম আমি। বাসায় গিয়ে মনে করিস, দেখাব।"

জামশেদ মামা তখনও হাঁটু গেড়ে মুখ হাঁ করে বসে আছেন। ঝুম্পু তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, "উঠুন মামা—এই জায়গাটা যা নোংরা, দিনের বেলা এলে বুঝবেন। আপনার প্যান্ট ময়লা হয়ে যাবে।"

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই খবর পেলাম জামশেদ মামা ভোরের ট্রেনে ঢাকা চলে গেছেন। তাঁর নাকি খুব একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়েছে।

ঝুম্পুকে তার গোল্ড মেডেলটা দেখাতে বলেছি, সে শুধু ধানাইপানাই করে, দেখাতে চায় না। কারণটা কী কে জানে!

==========

গ্রাউল

গ্রাউল তার আরামদায়ক চেয়ারটিতে গা ডুবিয়ে বসেছিল। হাতের উত্তেজক পানীয়ের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে সে নিচু গলায় ডাকল, "ক্রিটন!"

সামনের দেয়ালে চাপা একটি ঘরঘর শব্দ হচ্ছিল, শক্তিশালী পাম্প দিয়ে ক্রিটন-কম্পিউটারের প্রসেসরের ভিতর দিয়ে তাপপরিবাহী তরল পাঠানো হচ্ছে। দেয়ালে ইতস্তত কিছু বাতি জ্বলে এবং নিভে ওঠে এবং প্রায় সাথে সাথে ক্রিটন-কম্পিউটার তার আধাযান্ত্রিক গলায় বলল, "আমাকে ডেকেছেন মহামান্য গ্রাউল?"

"হ্যাঁ। আমার হিসেবটা একটু বের করো।"

গ্রাউল একজন বস্ত্রশিল্প ব্যবসায়ী—গ্রাউল গার্মেন্টস নামে তার পৃথিবীজোড়া ব্যাবসা। গত দুই বছরে তার ব্যাবসা বাড়াবাড়ি রকম ফুলেফেঁপে উঠেছে।

ক্রিটন কাছাকাছি একটা হলোগ্রাফিক স্ক্রীন খুলে সেখানে গ্রাউলের ব্যাবসার হিসেবপত্র দেখাতে শুরু করে। গ্রাউল এক নজর দেখে অধৈর্য হয়ে বলল, "আহ্! এই হিসেব না, অন্যটা।"

"কিন্তু মহামান্য গ্রাউল, অন্য হিসাবটি অসত্য। সেটি রাষ্ট্রের আইনভঙ্গকারী প্রক্রিয়ায় তৈরি। সেটি—"

গ্রাউল তার আরামদায়ক চেয়ারে সোজা হয়ে বসে পাশের টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "আমাকে তোমার নীতিকথা শোনাতে হবে না। আমি জানি আমি কী করছি।"

"মহামান্য গ্রাউল—" ক্রিটন-কম্পিউটার তার স্বভাবসুলভ শান্ত স্বরে বলল, "আপনি যদি এই অসত্য হিসেবটি ব্যবহার করেন তা হলে আইন

==========

ভঙ্গ করার অপরাধে আপনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে।"

গ্রাউল মুখ খিঁচিয়ে অত্যন্ত রূঢ়কণ্ঠে বলল, "তোমাকে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না। কী করলে আইন রক্ষা হয় এবং কী করলে আইন ভঙ্গ হয় সেটা আমি তোমার চাইতে ভালো করে জানি।"

"আপনি জানেন না মহামান্য গ্রাউল—"

"ব্যস!" গ্রাউল চিৎকার করে বলল, "অনেক হয়েছে। এবারে হিসেবটা বের করো।"

ক্রিটন বলল, "সেটিই যদি আপনার আদেশ হয়ে থাকে তা হলে দেখুন।"

প্রায় সাথে সাথেই গ্রাউলের কাছাকাছি হলোগ্রাফিক স্ক্রীনে তার বস্ত্রব্যবসায়ের হিসেবটুকু বের হয়ে আসে। গ্রাউল গত বছরের লাভের অঙ্কের সাথে আগামী বছরের সম্ভাব্য লাভটুকু যোগ করে বিশেষ পুলকিত হয়ে ওঠে। জিব দিয়ে মুখের ভিতরে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে গ্রাউল উৎফুল্ল গলায় বলল, "খারাপ না! কী বল ক্রিটন?"

"কিন্তু এটা অসত্য।"

"কোন জায়গাটা অসত্য?"

"এই যে আপনি আগামী বছরের সম্ভাব্য লাভ হিসেবে যে-পরিমাণটুকু দেখছেন সেটি সত্যি নয়। দুই বিলিওন ট্রাউজার এবং শার্টের জন্যে নিম্নশ্রেণীর পলিমার ব্যবহার করা হয়েছে। ট্রাউজার এবং শার্ট তৈরি করার পর সেগুলি সংরক্ষণের সময় যে-উত্তাপ দেওয়া হয় সেই উত্তাপে সেগুলি অন্তত দশ শতাংশ ছোট হয়ে গেছে। কাপড়গুলি আনুমানিকভাবে দশ সেন্টিমিটার ছোট। মানুষ কখনোই তার আকৃতি থেকে পরিমাণে ছোট কাপড় পরিধান করে না।"

গ্রাউল হাহা করে হেসে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ ক্রিটন।"

"তা হলে আপনি কীভাবে এইসকল ট্রাউজার এবং শার্ট বিক্রি করার কথা ভাবছেন? সেগুলি দশ সেন্টিমিটার ছোট।"

"যারা কিনবে তারাও দশ সেন্টিমিটার ছোট হয়ে যাবে।"

ক্রিটন-কম্পিউটার নিচু এবং শান্ত গলায় বলল, "আপনি কী বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"তুমি কি বিজানন এনজাইমের নাম শুনেছ?"

ক্রিটন-কম্পিউটার এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে তার তথ্যকেন্দ্র পরীক্ষা করে বলল, "জানি মহামান্য গ্রাউল। এই এনজাইমটি মানুষের উচ্চতাসংক্রান্ত জিনটির একটি অপ্রতিরোধ্য বিচ্যুতি ঘটিয়ে দেয়।"

==========

"হ্যাঁ।" গ্রাউল খিকখিক করে হেসে বলল, "মানুষের শরীরে এই এনজাইম পরিমাণমতো প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাদের উচ্চতা রাতারাতি দশ সেন্টিমিটার কমিয়ে আনা যায়।"

ক্রিটন-কম্পিউটার গম্ভীর গলায় বলল, "মাহমান্য গ্রাউল, এটি শুধু যে অন্যায়, আইন এবং নীতিবিরুদ্ধ তা-ই নয়, এটি মানুষের জন্যে বিপজ্জনক।"

গ্রাউল আবার হাহা করে উচ্চস্বরে হেসে বলল, "ন্যায়-অন্যায় খুব আপেক্ষিক ব্যপার। আর বিপদের কথা বলছ, জীবনটাই তো বিপজ্জনক।"

"যদি ধরে নিই আপনার কোম্পানির ছোট হয়ে যাওয়া জামা-কাপড় বিক্রি করার জন্যে পৃথিবীর মানুষকে দশ সেন্টিমিটার ছোট করা প্রয়োজন এবং সেজন্যে সবার শরীরের বিজানন এনজাইম ঢোকানো প্রয়োজন—"

"হ্যাঁ। তা হলে কী?"

"তা হলে আমার প্রশ্ন, আপনি সেটি কী করে করবেন? পৃথিবীর মানুষ কেন আপনাকে তাদের শরীরে বিজানন প্রবেশ করাতে দেবে?"

গ্রাউল একটি চোখ ছোট করে তার পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "তুমি কি ভাবছ ঢাকঢোল পিটিয়ে হৈচৈ করে পৃথিবীর মানুষের শরীরে বিজানন এনজাইম প্রবেশ করানো হবে?"

"তা হলে?"

"কাজটি করা হবে গোপনে। তাদের অগোচরে।"

"অগোচরে?"

"হ্যাঁ।"

"মহামান্য গ্রাউল—" ক্রিটন থমথমে গলায় বলল, "কাজটি ঘোরতর অন্যায়—আমি তবুও জানতে চাইছি সেটি কীভাবে করা হবে।"

গ্রাউল উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে বলল, "নবম মাত্রার কম্পিউটার হিসেবে তুমি নেহায়েত সাদাসিধে ধরনের।"

"সম্ভবত।"

"তুমি নিশ্চয়ই জান সম্প্রতি আমি শীতল পানীয় ব্যাবসায় প্রবেশ করেছি। পৃথিবীর একটি অন্যতম জনপ্রিয় পানীয়-কোম্পানি কিনে নিয়েছি।"

"জানি মহামান্য গ্রাউল। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সেটি একটি অলাভজনক বিনিয়োগ ছিল।"

"সাময়িকভাবে তা-ই মনে হতে পারে।" গ্রাউল তার পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "কিন্তু বিজানন এনজাইম শরীরে প্রবেশ করানোর জন্যে এর থেকে সহজ উপায় কী হতে পারে? আমার নিজের ফ্যাক্টরিতে পানীয়ের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে।"

==========

"কিন্তু মহামান্য গ্রাউল—"

"কাঁচামাল রপ্তানিকারককে কীভাবে ফাঁসানো হবে সেটিও ঠিক করে রাখা আছে। সেটা তোমাকে বলে লাভ নেই। তোমার হার্ডওয়ার অনেক উন্নত মানের হতে পারে, কিন্তু তুমি অপ্রচলিত কৌশল বোঝ না—"

"শব্দটি সম্ভবত অন্যায় কিংবা নীতিবিরুদ্ধ।"

"একই কথা।"

"কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা কী?"

"উদ্দেশ্য আদি এবং অকৃত্রিম টাকা। পৃথিবীটা কার? পৃথিবী টাকার।" গ্রাউল যেন অত্যন্ত উঁচুমানের রসিকতা করেছে সেভাবে হেসে উঠল।

ক্রিটন-কম্পিউটার তার হাসি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করে নিচু গলায় বলল, "কিন্তু আপনার তো অনেক টাকা!"

"আমার আরও চাই।"

"আরও কত চাই?"

"সেটা কি আর আগে থেকে বলা যায়? আরও অনেক চাই।"

ক্রিটন-কম্পিউটার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো শব্দ করল। তাকে মানুষের অনুকরণে কথা বলার জন্যে অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে।

গ্রাউল হলোগ্রাফিক স্ক্রীনে তার বিশাল টাকার পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করতে করতে মুখ দিয়ে একটি আরামদায়ক শব্দ বের করল, টাকার অঙ্ক নাড়াচাড়া করতে তার খুব ভালো লাগে। খানিকক্ষণ সংখ্যাগুলি দেখে সে তার নরম চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার গা ডুবিয়ে বসে বলল, "ক্রিটন!"

"বলুন মহামান্য গ্রাউল।"

"আমার সব টাকা দিয়ে হীরা কিনে রাখবে। এমনি টাকাকে বিশ্বাস নেই—তার দাম ওঠানামা করে। হীরা হচ্ছে নিরাপদ বিনিয়োগ।"

"কিনব মহামান্য গ্রাউল।"

"বড় বড় হীরা। কমপক্ষে একশো ক্যারটের সাইজ। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"আমার জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় হীরাটি কিনে ফেলা।"

"সেটি কত বড়?"

"আমার সমান ওজন। সাউথ আফ্রিকার হীরকখনি থেকে বের হয়েছে, স্মিথসনিয়ান মিউজিয়ামে আছে।"

"সেটি অসম্ভব মূল্যবান। আপনি এই মুহূর্তে সেটা কিনতে পারবেন না।"

==========

"জানি। সেইজন্যেই আমার আরও অনেক টাকার দরকার। একজন মানুষ যখন দাবি করতে পারে সে তার শরীরের সমান ওজনের হীরা কিনতে পারে তখন বুঝতে হবে সেই মানুষটি সফল। আমি সফল মানুষ হতে চাই ক্রিটন।"

"সাফল্যের আরও অন্যরকম সংজ্ঞা আছে মহামান্য গ্রাউল।"

"থাকুক। আমার সংজ্ঞা আমার কাছে। আমি আমার শরীরের সমান ওজনের হীরা কিনতে চাই। পৃথিবীকে দেখাতে চাই একজন মানুষ তার নিজের চেষ্টায় এত টাকা উপার্জন করতে পারে যে সে তার শরীরের সমান ওজনের হীরা কিনতে পারে।"

"মহামান্য গ্রাউল!"

"বলো।"

"আপনার এই ধরনের শখ কেন হয়েছে?"

"ইতিহাস পড়ে। প্রাচীনকালে সম্রাটদের সম্মান দেখানোর জন্যে তাদের শরীরের সমান ওজনের সোনা উপহার দেওয়া হত। তারা সুদৃশ্য একটা দাঁড়িপাল্লার এক পাশে বসে থাকতেন, অন্য পাশে প্রজারা সোনা দিতে থাকত। যখন সোনার পরিমাণ তার ওজনের সমান হয়ে যেত তখন দাঁড়িপাল্লা তাকে উপরে তুলে আনত। প্রজারা তখন আনন্দধ্বনি করত। একটা হাস্যকর পদ্ধতি—কিন্তু কার্যকর।"

"আপনিও সেই একই ব্যাপার করতে চান?"

"হ্যাঁ। তবে স্বল্পমূল্যের সোনা দিয়ে নয়। হীরা দিয়ে।"

"যদি এটা করতে পারেন তা হলে আপনিও টাকা উপার্জন বন্ধ করবেন?"

গ্রাউল হাহা করে হেসে বলল, "মনে হয় করব। একসময় তো থামতে হবে। কী বল?"

ক্রিটন কম্পিউটার কোনো কথা বলল না।

"কয়টা বাজে ক্রিটন?"

"অনেক রাত হয়েছে মহামান্য গ্রাউল। এখন বাজে রাত বারোটা। আপনার সম্ভবত শুয়ে পড়া উচিত।"

"হ্যাঁ, শুয়ে পড়ি।" গ্রাউল তার নরম চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

বিশাল ধবধবে বিছানায় শুয়ে গ্রাউল তার মাথার কাছে রাখা ক্রিস্টালের সুদৃশ্য গ্লাস হাতে নিয়ে পানীয়টাতে চুমুক দেয়। তার সুনিদ্রার জন্যে এই

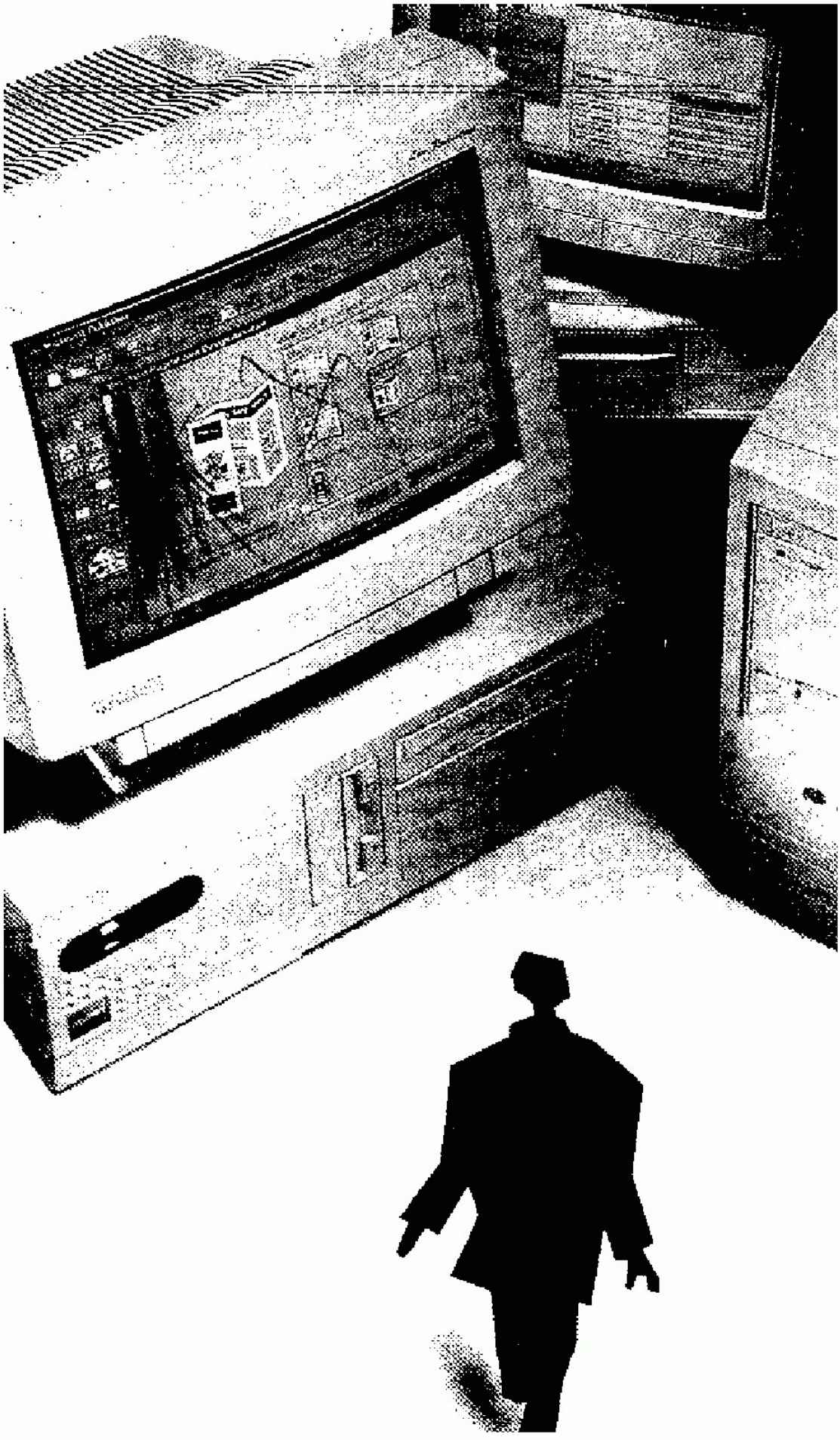

পানীয়তে নানা ধরনের জৈব এবং অজৈব উপাদান দ্রবীভূত আছে। ক্রিটন-কম্পিউটার তার শরীরকে বিশ্লেষণ করে এই উপাদানগুলি ঠিক করে দেয় মনে হয় এজন্যেই এই বয়সেও তার শরীর এরকম চমৎকার।

পানীয়টাতে ঝাঁজালো একধরনের গন্ধ। এক চুমুক খেতেই সারা শরীরে আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাউল তৃপ্তির একটা শব্দ করে আরেক চুমুকে পানীয়টা শেষ করে নেয়। প্রায় সাথে সাথেই তার চোখে মধুর একধরনের ঘুম নেমে আসে। চোখ বন্ধ করার আগে সে ক্রিটন-কম্পিউটারের গলার স্বর শুনতে পেল, "শুভ রাত্রি মহামান্য গ্রাউল।"

"শুভরাত্রি।"

"আপনার আনন্দময় নিদ্রা হোক।"

গ্রাউল উত্তরে কিছু বলার আগেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

ঘুম ভাঙার পর চোখ খুলে গ্রাউলের মনে হল কিছু-একটা ঠিক নেই। সে তার ধবধবে সাদা বিছানায় শুয়ে আছে, মাথার কাছে কারুকার্যময় টেবিল, ঘরে পরিচিত আসবাব, সুদৃশ্য অলঙ্কাটা ছাদ, দেওয়ালে দুষ্প্রাপ্য তৈলচিত্র, কিন্তু তবুও কোথাও যেন কিছু-একটায় গোলমাল রয়েছে। ঠিক কী জিনিসটার গোলমাল সে বুঝতে পারল না। ভালো করে চোখ খুলে তাকিয়ে মনে হল সবকিছু যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। গ্রাউল প্রায় ধড়মড় করে উঠে বসল, হঠাৎ করে মনে হল তার ধবধবে বিছানাটি খেলার মাঠের মতো বড়। মাথার কাছে টেবিলটি কাছে থেকেও অনেক দূরে, অনেক বিশাল। ঘরের ছাদ অনেক উঁচুতে, দুষ্প্রাপ্য তৈলচিত্রগুলি অনেক উঁচু থেকে ঝুলছে। কী হচ্ছে চারিদিকে?

গ্রাউল ভয়-পাওয়া গলায় ডাকল, "ক্রিটন!"

দেওয়ালে কিছু বাতি জ্বলে উঠল এবং ক্রিটন-কম্পিউটার তার আধাবাস্তিক গলায় বলল, আমাকে ডেকেছেন মহামান গ্রাউল?"

"কী হচ্ছে এখানে? সবকিছু এরকম মনে হচ্ছে কেন?"

"আপনি ছোট হয়ে গেছেন মহামান্য গ্রাউল।

"কী বললে?"

"আপনার পানীয়ের সাথে গতরাতে নয় মিলিগ্রাম বিজ্ঞানন এনজাইম মিশিয়ে দিয়েছি। এই পরিমাণ এনজাইম আপনার দেহের আকৃতিকে কমিয়ে এক ফুটের কাছাকাছি নিয়ে আসবে।"

"কী বললে? কী—কী—"

==========

"আপনার জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে দিয়েছি মহামান্য গ্রাউল। আপনার ওজন এখন মাত্র দেড় কেজি। আপনার অর্থ দিয়ে আপনি এখন আপনার সমান ওজনের একাধিক হীরা কিনতে পারবেন।"

গ্রাউল নিজের দিকে তাকাল, সামনে আয়নাতেও সে নিজেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সত্যি সত্যি সে ছোট হয়ে গেছে। একটা খেলনা-পুতুলের মতো। ভয়ংকর আতঙ্কে সে চিৎকার করে ওঠে।

ক্রিটন-কম্পিউটার নিচু গলায় বলল, "মহামান্য গ্রাউল, আপনার বর্তমান ওজনের কয়েকটি হীরা আছে। আপনি কোনটা কিনতে চান?"

গ্রাউল আবার একটা চিৎকার করে ওঠে। বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার পা পিছলে যায়, বিছানার নিচে পড়তে গিয়ে সে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বিছানার চাদর ধরে ঝুলে পড়ল। গ্রাউল সেই অবস্থায় আতঙ্কে তার দুই পা ছুড়তে থাকে।

দেড় কেজি ওজনের একজন ন্যাংটা মানুষ বিছানার চাদর ধরে ঝুলছে—দৃশ্যটি অত্যন্ত হাস্যকর। ক্রিটন কম্পিউটারের মাঝে হাসির অনুভূতি দেওয়া হয় নি বলে সে অবিশ্যি সেটি ধরতে পারল না। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সে গ্রাউলের জন্যে কিছু হীরা বাছতে শুধু করল।

==========

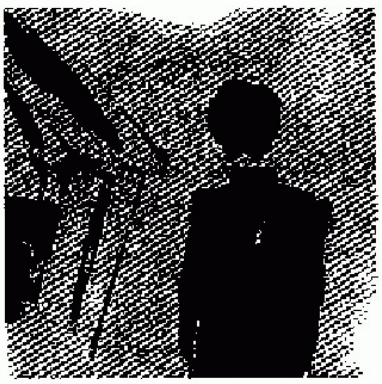

শকসো

ঢাকা থেকে জরুরি কাজে সিলেট যাব, তাড়াহুড়ো করে এয়ারপোর্টে এসে শুনি ফ্লাইটটা দুই ঘণ্টা পিছিয়ে দিয়েছে। আমার মতো আরও অনেক যাত্রী বিরস মুখে বসে আছে—প্লেনের যাত্রীরা একটু ভদ্রগোছের বলে মনে হয়, না হলে এতগুলো মানুষকে এক কথায় দুই ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়ার পরও কোনো চ্যাঁচামেচি হৈচৈ নেই, ঝগড়াঝাঁটি বাগ্‌বিতণ্ডা নেই।

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে হাতের খবরের কাগজটা প্রায় মুখস্থ করে ফেললাম। কাগজের চতুর্থ এবং পঞ্চম পৃষ্ঠায় মফস্বলের অনেক খবর থাকে। মফস্বলে ভালো কিছু ঘটে বলে মনে হল না, বেশির ভাগই খুন-জখম এবং অ্যাসিড মারার গল্প, প্রথম এক-দুই লাইন পড়ে আর বিস্তারিত পড়ার ইচ্ছা করে না। কাগজটা ভাঁজ করে রেখে দেখলাম আমার পাশে মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ বসে আছেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "সিলেট যাচ্ছেন?"

"জি।"

"প্লেন কেন লেট হয়েছে জানেন?"

"না।"

"বিমানমন্ত্রী কলকাতা গিয়েছেন শাড়ি কিনতে।"

"শাড়ি কিনতে?"

"হ্যাঁ। শালীর বিয়ে।"

শাড়ি কেনার সাথে সিলেটে প্লেন লেট হবার সম্পর্ক কী আমি বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "মন্ত্রী শাড়ি কিনলে আমাদের প্লেন লেট হবে কেন?"

==========

"একটাই তো প্লেন। সেই প্লেন কলকাতা থেকে ফিরে আসবে, তারপর আমাদের নিয়ে সিলেট যাবে।"

আমি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললাম, "সত্যি বলছেন?"

"সত্যি। একেবারে পাকা খবর। ফ্লাইট ম্যানেজার আমার বিশেষ বন্ধুমানুষ। সে খবর দিয়েছে। মন্ত্রীসাহেব তাঁর মিসেসকে নিয়ে বাজারে চলে গেছেন। ইন্সট্রাকশান দেওয়া আছে যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ প্লেনটাকে আটকে রাখতে হবে।"

আমি চোখ বড় বড় করে তাকালাম, ভদ্রলোক হাসিহাসি মুখ করে বললেন, "এত অবাক হচ্ছেন কেন? এরকমই তো চলছে। মোগল বাদশারা যেরকম সারা দেশের সবকিছুর মালিক ছিল আমাদের মন্ত্রীরাও তা-ই। তারা সবকিছুর মালিক!"

আমি মাথা নেড়ে একটা নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসলাম। ভদ্রলোক চেয়ারে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সিলেটে নূতন যাচ্ছেন।"

"না। সেখানেই থাকি।"

"সুন্দর জায়গা! বিউটিফুল!"

কথা বলার জন্যে কথা বলা। তাই আমাকেও ভদ্রতা করে কিছু-একটা জিজ্ঞেস করতে হয়। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কোথায় থাকেন?"

'বেশির ভাগ সময় ঢকাতেই থাকি। বাকি সময়টা চিটাগাং আর খুলনা। মাঝে মাঝে রাজশাহী সিলেট।"

"ও।" আরও কিছু জিজ্ঞেস করা যায় কি না ভাবছিলোম, তার মাঝে ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কী করেন আপনি?"

"আমি পড়াই। ইউনিভার্সিটিতে।"

"ও! ভেরি গুড।" ভদ্রলোক এমনভাবে মাথা নাড়লেন যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করা একটা সাংঘাতিক কাণ্ড! আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি?"

"আমি?" আমি এখন বিজনেস করি।"

"আগে অন্যকিছু করতেন?"

"হ্যাঁ। আগে ডাক্তার ছিলাম। সার্জন।"

"সার্জন?" আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "সার্জারি ছেড়ে দিলেন কেন?"

ভদ্রলোক উত্তর না দিয়ে তাঁর ডান হাতটা আমার সামনে এনে মেলে ধরলেন, আমি দেখলাম তাঁর বুড়ো আঙুলটা নেই, কেউ যেন নিখুঁতভাবে কেটে নিয়েছে। আমি একটু হকচকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কোনো অ্যাকসিডেন্ট?"

==========

"নাহ্।"

"তা হলে?"

"কেটে ফেলেছি।"

"কেটে ফেলেছেন? কোনোরকম ইনফেকশান?"

"উঁহুঁ। ইনফেকশান নয়। এমনিতেই কেটে ফেলেছি।"

"এমনিতেই কেটে ফেলেছেন? এমনি কেউ আঙুল কেটে ফেলে?"

"তা ঠিকই বলেছেন, খামোকা কে আঙুল কেটে ফেলবে? তাও বুড়ো আঙুল। সার্জনের বুড়ো আঙুল! কারণ অবিশ্যি একটা ছিল।"

আমি একটু কৌতূহল নিয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। নিজে থেকে না বললে কারণটা জানতে চাওয়া ভদ্রতা হবে কি না বুঝতে পারছিলাম না। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, "আপনি যদি শুনতে চান তা হলে বলতে পারি। গল্পটা এখনও কেউ বিশ্বাস করে না—আপনি যদি না চান আপনাকেও বিশ্বাস করতে হবে না।"

"কেন বিশ্বাস করব না?"

"শুনলেই বুঝতে পারবেন। যা-ই হোক—" বলে ভদ্রলোক তাঁর বুড়ো আঙুলবিহীন হাতটা সামনে তুলে সেটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমার নাম মাহবুব খন্দকার।"

আমি নিজের নাম বলতেই তিনি করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আঙুলবিহীন হাত করমর্দন করতে আমার গা একটু কাঁটা দিয়ে উঠল, কেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোক এতক্ষণ বেশ হাসিহাসি মুখেই বসে ছিলেন, এবারে গল্প শুরু করার আগে হঠাৎ কেমন জানি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

গল্পটা ছিল এরকম। তাঁর ভাষাতেই বলা যাক।

আমার জন্ম অক্টোবরের নয় তারিখ, সেটা হচ্ছে তুলারাশি। তুলারাশির মানুষেরা নাকি ভূত-প্রেত পরলোক এসব অলৌকিক জিনিসে উৎসাহী হয়। সেটা সত্যি কি না আমি জানি না, কিন্তু আমার আসলেই ভূত-প্রেত এসবে খুব উৎসাহ ছিল। কাউকে জিনে ধরেছে বা পরীতে বশ করেছে শুনলে আমি দেখতে যেতাম, বন্ধুদের সাথে বাজি ধরে পোড়োবাড়িতে রাত কাটিয়েছি, লাশকাটা-ঘরে ঘুরে বেড়িয়েছি। প্ল্যানচেট করেছি, চক্রে বসেছি, অমাবশ্যার রাতে শ্মশানে গিয়েছি, জিন বশ করার দোয়া-দরুদ পড়েছি, কিন্তু আমার কপালই হোক আর যা-ই হোক সত্যিকারের অলৌকিক কিছু কখনো দেখি নি। প্রায়-ভৌতিক অনেক কিছু আছে, কিন্তু সত্যিকারের ভৌতিক ব্যাপার যার ব্যাখ্যা নেই সেরকম কিছু একবারও দেখতে পেলাম না।

==========

মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হওয়ার পর ভূত-প্রেত কিংবা অলৌকিক জিনিসে আকর্ষণ খানিকটা কমে এল। অ্যানাটমি ক্লাসে বেওয়ারিশ লাশ কাটাকুটি করে আর ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে খুন-জখম অ্যাকসিডেন্টে মানুষকে মারা যেতে দেখে দেখে মন খানিকটা কঠোর হয়ে গেছে। তখন ভূত-প্রেত আর জিন-পরীতে আকর্ষণ বেশি থাকতে পারে না। তবুও আকর্ষণ যে একেবারে চলে গেল তা নয়, অলৌকিক জিনিসের গন্ধ পেলে একবার টুঁ মেরে আসতাম।

মেডিক্যাল কলেজ শেষ করে বিলেত গেলাম, সেখান থেকে এফ. আর. সি. এস. ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসেছি। দেশে আমার তখন খুব রমরমা প্র্যাকটিস। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রায় কশাইয়ের মতো মানুষকে কেটে ফেলি, ব্যাংকে টাকা রাখার জায়গা নেই। কয়েকটা ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগ রয়েছে—দিনে দু-চারটে অপারেশন করতে হয়। একদিন গলব্লাডার স্টোনের জন্যে একজন মহিলাকে কাটব, ভদ্রমহিলা হঠাৎ কাতর স্বরে বললেন, "ডাক্তার সাহেব, আমাকে কেন কাটাকুটি করছেন? আমি তো বাঁচব না।"

আমি হাহা করে হেসে বললাম, "আমি কি এতই খারাপ সার্জন যে গলব্লাডার স্টোন সরাতে গিয়ে আপনাকে মেরে ফেলব?"

"সেটা নয়।" ভদ্রমহিলা ফিসফিস করে বললেন, "আমার আসলে ক্যান্সার হয়েছে।"

"ক্যান্সার?" আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, "আপনি কেমন করে জানেন?"

"আমাকে একজন বলেছে?

"যিনি বলেছেন তিনি কি ডাক্তার? বায়োপসি করেছে?"

"না।" ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, "তার কিছু করতে হয় না। এমনিতেই বলতে পারে।"

আমি খুব কষ্ট করে বিরক্তি গোপন করে বললাম, "যিনি আপনাকে এরকম একটা কথা বলেছেন তিনি খুব অন্যায় করেছেন। আমি আপনার পেট খুলছি—আপনাকে জানাব যে আপনার ক্যান্সার নেই।"

যাই হোক, অপারেশান টেবিলে পেট খুলে আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম। সত্যি সত্যি ক্যান্সার—ভিতরে পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়েছে, আমাদের কিছু করার নেই। আমি আবার বন্ধ করে ফিরে এলাম, তিনদিন পর ভদ্রমহিলা মারা গেলেন, মারা যাবার আগে তাঁর কাছ থেকে আমি সেই মানুষটার ঠিকানা নিয়ে রাখলাম।

==========

কয়দিন পর ঠিকানা খুঁজে খুঁজে আমি সেই মানুষটাকে খুঁজে বের করেছি। পুরানো ঢাকার এক ঘিঞ্জি অন্ধগলিতে একটা ছোট অন্ধকার মশলার দোকানে উবু হয়ে বসে মশলা বিক্রি করছে। আধ্যাত্মিক মানুষের যেরকম চেহারা হওয়ার কথা তার চেহারা মোটেও সেরকম নয়। শুকনো তোবড়ানো গাল, কোটরাগত চোখ, থুতনিতে ছাগলের মতো দাড়ি, মাথায় তেলচিটাচিটে টুপি, গুনে গুনে ময়লা নোট ক্যাশবাক্সে রাখছে।

আমি পরিচয় দিয়ে বললাম, "আমি আপনার কাছে একটা কথা জানতে এসেছি।"

"রোগীর কথা জনতে এসেছেন? আমি কিন্তু শনি-রবিবার ছাড়া বলি না।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না, আমি রোগীর কথা জানতে আসি নাই। আপনি কেমন করে রোগীর কথা বলেন সেটা জানতে এসেছি।"

আমার কথা শুনে মানুষটা হঠাৎ মুখ শক্ত করে আমার দিকে রুক্ষ চোখে তাকাল। কঠোর গলায় বলল, "সেটা শুনে আপনি কী করবেন?"

"আমি জানতে চাই।"

"সব জিনিস সবাই জানতে পারে না। আপনি বাড়িতে যান।" বলে লোকটা আমাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে তার খরিদ্দারদের জন্যে জিরা ওজন করতে শুরু করল।

আমি অবিশ্যি হাল ছেড়ে দিলাম না, লোকটার পিছনে একেবারে চিনেজোঁকের মতো লেগে রইলাম। কখনো কাকুতি-মিনতি, কখনো ভয়-ভীতি, কখনো মিষ্টি কথা, কখনো শক্ত কথা কিছুই বাকি রাখলাম না। শেষ পর্যন্ত যে-জিনিসটা কাজে দিল সেটা হচ্ছে নগদ টাকা। আমি একবারও চিন্তা করি নি টাকা দিয়ে মানুষটাকে নরম করা যাবে, তা হলে প্রথম সেটা দিয়েই শুরু করতাম।

লোকটাকে নগদ দুই হাজার টাকা দেওয়ার পর টাকাগুলো গুনে ক্যাশবাক্সে রেখে বলল, "আমার পোষা শকসো আছে।"

"পোষা কী?"

"শকসো।"

"সেটা কী?"

"জিনের মতো কিন্তু জিন না। জিন তো আগুনের তৈরি, এটা আগুনের না। এইটা রক্তমাংসের। রক্ত খায়।"

"রক্ত খায়?"

"হ্যাঁ।"

==========

"সেটা পায় কোনখানে?"

"শরীরের মাঝে থেকে চুষে নেয়।"

"কার শরীর থেকে?"

"আমার পোষা শকসো—আমার শরীর থেকে খায়।"

আমি গাঁজাখুরি গল্প শুনে হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। মানুষটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। দুই দুই হাজার টাকা একেবারে অকারণে পানিতে ফেলে দিয়েছি বলে আফসোস হতে লাগল। একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "এই শকসো কী করে?"

"বেশি কিছু করতে পারে না। রোগ শোক হলে বলে দিতে পারে। ওষুধপত্র দেয় মাঝে মাঝে।"

"কেমন করে দেয়?"

"বলে দেয়।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "বলে দেয়? কেমন করে বলে?"

"এই তো আপনাকে আমি যেভাবে বলি।"

"তার মানে আপনি তাকে দেখতে পারেন।"

বুড়ো তার দাড়ি নেড়ে বলল, "না দেখলে কথা বলব কেমন করে?"

আমি মুখ শক্ত করে বললাম, "আমাকে দেখাতে পারেন?"

"নাহ্।" বুড়ো মাথা নেড়ে বলল, "অন্য কেউ থাকলে বের হয় না।"

"কেন বের হয় না?"

"সবকিছুর একটা নিয়ম আছে না? মানুষের নিয়ম মানুষের শকসোর নিয়ম শকসোর।"

আমি হতাশ হয়ে বললাম, "তার মানে আমি কোনোদিন দেখতে পারব না?"

"পারবেন না কেন? আপনি দেখতে চাইলে আপনি শকসো পোষেন।"

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, "আমি পুষতে পারব?"

বুড়ো মানুষটা তার কোটরাগত চোখে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ইচ্ছা করলে মানুষ কী না পারে! তবে—"

"তবে কী?"

"শকসো পোষা কিন্তু কুত্তা-বিলাই পোষার মতো না।"

"বুঝতে পারছি।"

"বিপদ আছে।"

"বিপদ-আপদ আমার ভালোই লাগে।"

==========

মানুষটা খুব শ্লেষের ভান করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তা হলে তো ভালোই।"

তারপর তার ক্যাশবাক্সের নিচে হাত ঢুকিয়ে একটা জীর্ণ কাগজ বের করে আনল। এই প্রথমবার আমি লক্ষ করলাম তার ডান হাতটা পঙ্গু—শুকনো এবং শক্তিহীন, শুধু হাতের বুড়ো আঙুলটি বড় এবং অতিকায়। শুধু তা-ই নয়, দেখে মনে হল আঙুলটি যেন তার নিয়ন্ত্রণে নেই, হঠাৎ হঠাৎ সেটি নড়ছে।

দুই হাজার টাকার বিনিময়ে আমি একটা জীর্ণ কাগজে লেখা একটি মন্ত্র এবং সেই মন্ত্রপাঠের কিছু নিয়মাবলী নিয়ে ফিরে এলাম। ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখে খানিকটা সরিষার তেল মাখিয়ে সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মন্ত্র পড়তে হবে। মন্ত্র পড়ার আরও কিছু নিয়ম-কানুন আছে, গুরুপাক খাবার খাওয়া যাবে না, কাঁচা রসুন খাওয়া যাবে না, পরিষ্কার কাপড় পরে থাকতে হবে, অন্যকিছুতে মনোযোগ দেওয়া যাবে না, শুরু করতে হবে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে ইত্যাদি ইদ্যাদি। দীর্ঘ মন্ত্র, সেটা শুরু হয়েছে এভাবে :

আচাতন, কুচাতন গিলাবালী মা
মাকাতালী রাখাতালি শুশুতালি ফা

এর পরে আরও আঠারো লাইন। এটা কী ভাষায় লেখা, এর অর্থ কী কিছুই জানি না তবুও আমি শুরু করে দিলাম। আমার স্ত্রী খুব বিরক্ত হল, কিন্তু আমি যখন শুরু করে দিয়েছি এখন তো এর শেষ না দেখে ছাড়তে পারি না। গভীর রাতে গোসল করে পরিষ্কার কাপড় পরে বারান্দায় বসে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে সরিষার তেল মাখিয়ে বিড়বিড় করে আচাতন কুচাতন পড়তে থাকি। এইভাবে একদিন দুইদিন করে দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেল, কিন্তু শকসোর দেখা নেই। আমি যখন মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছি যে ধড়িবাজ মানুষটা আমাকে ঠকিয়ে দুই হাজার টাকা মেরে দিয়েছে, তখন এক রাতে খুব বিচিত্র একটা ঘটনা ঘটল। নখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছি, হঠাৎ মনে হল আমার বুড়ো আঙুলটা যেন একটু নড়ে উঠল, মনে হল আঙুলটা যেন আমার নিজের না, যেন অন্য কারও। আমি অবাক হয়ে দেখলাম নখের নিচে হঠাৎ করে কেমন যেন কালচে রং দেখা যাচ্ছে, হঠাৎ করে ব্যথা পেয়ে কালশিটে পড়ে গেলে যেরকম হয় অনেকটা সেরকম। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, মনে হল বুড়ো আঙুলের ভিতরে কিছু-একটা নড়ছে, বিচিত্র একধরনের অনুভূতি। নখের মাঝে কালো রংটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল এবং মনে হল তার পিছন থেকে জীবন্ত কিছু-

==========

একটা নড়ছে। হালকা গোলাপি রঙের জিনিসটা নড়তে নড়তে স্পষ্ট হতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সেটা একটা প্রাণীর রূপ নিতে থাকে। চেহারা দেখে মনে হয় অনেকটা মানুষের মতো, কিন্তু যেন পুরোপুরি মানুষ নয়। শুধু তা-ই নয়, আমার মনে হতে লাগল প্রাণীটা যেন আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম, মন্ত্র পড়া বন্ধ করে লাফিয়ে উঠে হাত ঝাঁকাতে শুরু করলাম যেন অশুভ এই প্রাণীটাকে ঝাঁকিয়ে হাত থেকে ফেলে দেওয়া যাবে। প্রায় সাথে সাথেই বুড়ো আঙুলের অসাড় হয়ে থাকা বিচিত্র অনুভূতিটা কমে গিয়ে সেটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। আমি তাকিয়ে দেখি নখটাও স্বাভাবিক হয়ে এসছে, দেখে কে বলবে একটু আগে সেখানে বিচিত্র জীবন্ত কিছু-একটা দেখা গেছে!

ব্যাপারটা কি আসলেই ঘটেছে নাকি এটা আমার মনের ভুল আমি সে-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না, কিন্তু এই মাঝরাত্তিরে কেন জানি সেটা আর পরীক্ষা করে দেখার সাহস হল না। সে-রাতে আমার ঘুম হল ছাড়া-ছাড়া ভাবে, মাঝরাতে হঠাৎ ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে জেগে উঠলাম। পাশে আমার স্ত্রী শুয়েছিল, সে ভয় পেয়ে জেগে উঠে আমাকে ধরে বলল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার?"

আমি কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে কাঁপা গলায় বললাম, "খুব ভয়ের একটা স্বপ্ন দেখছিলাম—"

"কী স্বপ্ন দেখেছ?"

ভয়ের স্বপ্ন দেখতে যেরকম ভয় হয় বলতে গেলে কিন্তু সেরকম হয় না—বরং সেটাকে কেমন জানি ছেলেমানুষি এবং হাস্যকর শোনায়। আমি তাই কিছু না বলে আবার শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে অবিশ্যি আমার কাছে গতরাতের পুরো ব্যাপারটাকেই ছেলেমানুষি আর হাস্যকর মনে হতে লাগল। নখের মাঝে একটা-কিছু দেখা নিশ্চয়ই চোখের ভুল ছিল। সেখানে সর্ষের তেল মাখানোর জন্যে চকচক করছিল বলে হয়তো কোনোকিছুর প্রতিফলন পড়ছিল, মাঝরাত্তিরে উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনায় সেটাকেই মনে হয়েছে বিদঘুটে কোনো প্রাণী—মশলার দোকানের বুড়োর ভাষায়—শকসো! ব্যাপারটা খানিকক্ষণ চিন্তা করে আমি মন থেকে দূর করে দিলাম।

পরবর্তী কয়েকদিন আমি কাজকর্ম নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। শরীরটাও কেমন যেন ঠিক ভালো ছিল না, কড়া অ্যান্টিবায়োটিক খেলে যেমন অস্থির অস্থির লাগে সারাক্ষণই সেরকম লাগছিল। সমস্যাটা কোথায় ঠিক ধরতে পারছিলাম না, কিন্তু শুধু মনে হতে থাকে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে কিছু-

==========

একটা হয়েছে। একদিন বেশ রাত করে বাসায় ফিরে এসেছি—আমার স্ত্রী তার এক দূর সম্পর্কের বোনের বিয়েতে গেছে, বাসায় আমি একা। রাত্রিবেলা ঘুমানোর আগে আমার হঠাৎ নখের মাঝে ছবি দেখার কথা মনে পড়ল। আমি নখের দিকে তাকিয়ে অনেকটা অভ্যাসের বশেই আচাতন কুচাতন মন্ত্র পড়তে শুরু করে দিলাম এবং কী আশ্চর্য, সাথে সাথে হঠাৎ আমার বুড়ো আঙুলটা অসাড় হয়ে গেল, মনে হল ওটার ভিতরে কিছু নড়ছে এবং দেখতে দেখতে বুড়ো আঙুলের নখটা কালচে নীল রঙের হয়ে গেল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলাম, দেখতে পেলাম সেই কালচে নীল রঙের ভেতর থেকে একটা প্রাণীর চেহারা ভেসে আসছে, সেদিনের মতো এত অস্পষ্ট নয়, আজ এটি স্পষ্ট এবং এক কথায় ভয়াবহ।

নখের মাঝে ছোট একটি প্রাণী। কিন্তু সেটি স্পষ্ট, তার খুঁটিনাটি সব দেখা যাচ্ছে। প্রাণীটি মানুষের মতো, কিন্তু মানুষ নয়। এর উঁচু এবং আসমান কপাল, ভুরুহীন কুতকুতে চোখ, স্থির দৃষ্টি, ছোট নাক, নাকের ঠিক নিচেই বিস্তৃত একটা মুখ। আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মুখটা হাঁ করল এবং দেখতে পেলাম দাঁতহীন জিবহীন সরীসৃপের মতো লালচে পিচ্ছিল একটা মুখ। আমার সমস্ত শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল।

আমার ইচ্ছে করল আতঙ্কে চিৎকার করে ছুটে পালাই, কিন্তু একজন মানুষ নিজের বুড়ো আঙুল থেকে কেমন করে ছুটে পালাবে? আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম, বিড়বিড় করে নিজেকে বললাম, "ভুল দেখছি। আমি নিশ্চয়ই ভুল দেখছি। আমি যদি চোখ বন্ধ করি তা হলে চোখ খুলে দেখব কিছু নেই।"

আমি খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে থেকে আবার চোখ খুললাম, ভয়ে ভয়ে আবার বুড়ো আঙুলের দিকে তাকালাম, দেখতে পেলাম কুৎসিত প্রাণীটা এখনও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি হতবুদ্ধি হয়ে প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, ঠিক তখন প্রাণীটা মাথা নাড়ল ডান থেকে বামে তারপর বাম থেকে ডানে। প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর দ্রুত। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে সে যদি মাথা নেড়ে না বোঝাতে চায় অনেকটা সেরকম। প্রাণীটা হঠাৎ মাথা নাড়া বন্ধ করে মুখ হাঁ করল, আমি আবার তার দাঁতহীন জিবহীন লালচে মুখগহ্বর দেখতে পেলাম। প্রাণীটা স্থিরচোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমার ভুলও হতে পারে কিন্তু মনে হল সেটি যেন ক্রূর ভঙ্গিতে হাসল। তারপর হঠাৎ করে সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি দীর্ঘ সময় একাকী বসে রইলাম, লক্ষ করলাম আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

==========

পরদিন পুরানো ঢাকায় সেই ঘিঞ্জি গলিতে গিয়ে বুড়ো মানুষটাকে খুঁজে বের করলাম। মানুষটা আমাকে দেখে তার পান-খাওয়া দাঁত বের করে হাসার চেষ্টা করে বলল, "খবর ভালো?"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "বুঝতে পারছি না।"

"শকসো কি এসেছে?"

"ইয়ে মানে নখের মাঝে দেখলাম—"

লোকটা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তার মানে এসেছে। সাবধানে থাকবেন এখন। উলটাপালটা কিছু হলে বিপদ হতে পারে।"

"বিপদ?"

"হ্যাঁ।" বুড়ো মানুষটা দাঁত বের করে আবার হাসার ভঙ্গি করে বলল, "শকসো আপনার শরীরে বাসা তৈরি করছে। সেখানে থাকবে এখন থেকে। আপনার রক্ত খেয়ে বড় হবে। কাজেই ভালো করে খাবেন। মাছ গোশত আর পালংশাক।"

আমি হতবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, মানুষটা গলা নিচু করে বলল, "বেশি জানাজানি যেন না হয়। জানাজানি হলে অনেক সমস্যা।"

"কী সমস্যা?"

"লোকজন ভয় পায়। কাছে আসে না। আর লোকজনকে দোষ দেবেন কেমন করে,—ভয় পাওয়ারই তো কথা! প্রথম প্রথম আমারও ভয় লাগত।"

"এখন লাগে না?"

"না। অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনারও অভ্যাস হয়ে যাবে। তবে শকসোরে একটু কন্ট্রোলে রাখবেন। শরীরের ভিতরে সব জায়গায় যেতে দিবেন না। আপনি টের পাবেন শরীরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, নড়ছে, আপনি কন্ট্রোল করবেন।"

লোকটার কথা শুনে আমার সমস্ত শরীর গুলিয়ে এল। আমি হতচকিতের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মানুষটা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ভয় পাবার কিছু নেই। শকসো অনেক কাজে আসে। রোগশোক বালা মুসিবত বলতে পারে। তার কিছু সিগনাল আছে। যেমন ধরেন মাথা নাড়া—"

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, "যদি ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ে তার অর্থ কী?"

লোকটা চমকে আমার দিকে তাকাল, বলল, "মাথা নেড়ে না করছে?"

"অনেকটা সেরকম।"

==========

"সর্বনাশ!"

"কেন? কী হয়েছে?" কথা বলতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেল।

"এইটার অর্থ খুব খারাপ। এইটার অর্থ কেউ-একজন মারা যাবে।"

"কে মারা যাবে?"

"শকসোকে ডাকার আগে আপনি যাকে ছুঁয়েছেন।"

আমি মনে করার চেষ্টা করলাম সেদিন বাসায় ফেরার আগে আমি শেষবার কাকে ছুয়েছি। ক্লিনিকে আমার কোনো-একজন রোগী? কাগজ বুঝে নেবার সময় কোনো-একজন নার্স? ড্রাইভার? সিগারেটের দোকানের কমবয়সী ছেলেটা? আমি ভেবে পেলাম না।

বুড়ো মানুষটা গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, "শরীরের মাঝে শকসো রাখা খুব বড় কাজ। জন্ম মৃত্যু আল্লাহ্‌র হাতে কিন্তু শকসো থাকলে সে ইঙ্গিত দেয়। বড় কঠিন ইঙ্গিত। আপনার হাতে সেই ইঙ্গিত—এটা খুব বড় দায়িত্ব। সাবধানে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে—নইলে কিন্তু গোনাগার হবেন।"

পুরানো ঢাকার ঘিঞ্জি গলিতে মশলার দোকানের সেই বৃদ্ধের কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি নি—বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে, শরীরের ভিতরে রক্ত খেয়ে ভিন্ন কোনো প্রাণী বেঁচে থাকলে তাকে কোনো-না-কোনোভাবে ধরা সম্ভব, টেস্টটিউবে ভরে সেটাকে টিপেটুপে দেখা সম্ভব। নখের নিচে এসে কেউ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে পারবে না। আমি নিজের চোখে দেখলেও সেটা বিশ্বাস করব না।

বাসায় এসেই অবিশ্যি আমার সেটা বিশ্বাস করতে হল। আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে—এইমাত্র তার খবর এসেছে। একটা এন.জি.ও.-তে চাকরি করত, ময়মনসিংহ যাচ্ছিল, উলটো দিক থেকে একটা ট্রাক এসে ধাক্কা দিয়েছে। গাড়িতে চারজন ছিল—তিনজন সাথে সাথে মারা গেছে, চতুর্থজন হাসপাতালে এখনও সংজ্ঞাহীন। আমার বন্ধু তিনজনের একজন। আমার এখন মনে পড়েছে রাত্রিবেলা তার সাথে কথা বলে যাবার আগে পিঠে একটা থাবা দিয়ে এসেছিলাম—আমার হাতে তাকেই আমি শেষবার স্পর্শ করে এসেছিলাম। শকসো ঠিক ইঙ্গিতই দিয়েছে।

ঘটনাটি আমাকে সাংঘাতিকভাবে নাড়া দিল, শরীরের মাঝে বিদঘুটে একটা প্রাণী বাস করছে, মানুষের জীবন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছে, সেটা নিয়ে আমার খুব-একটা মাথাব্যথা হল না—কিন্তু হাট্টা কাট্টা প্রাণবন্ত একজন মানুষ যে একেবারে হঠাৎ করে মারা যেতে পারে সেটা আমার জন্যে গ্রহণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ল।

==========

যাই হোক, তারপর অনেকদিন কেটে গেছে, বুড়ো আঙুলে সেই অশরীরী প্রাণীর কথা আমি একরকম ভুলে গেছি, তখন একদিন ক্লিনিকে একটা রোগী এসেছে। কমবয়সী বাচ্চা, হৃৎপিণ্ডের ভাল্ব নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে, অত্যন্ত জটিল অপারেশান, আমাদের দেশে তখনও কেউ সেটা সাহস করে করছে না। অপারেশান করার আগের রাতে আমি তাকে দেখতে গিয়েছি, বিছনায় ম্লান মুখে শুয়ে আছে। আমি তার হাত স্পর্শ করলাম, হঠাৎ কী মনে হল বিড়বিড় করে সেই মন্ত্র পড়তে শুরু করলাম, আচাতন কুচাতন গিলাবালী মা ...

প্রায় সাথে সাথেই বুড়ো আঙুলে কুৎসিত সেই মাথাটা ফুটে উঠল। মাথাটি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে কয়েকবার উপরে-নিচে করল, কোনোকিছুতে সম্মতি জানাতে হলে আমরা যেভাবে মাথা নাড়ি। তারপর হঠাৎ করে সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ডাক্তার-মানুষ, আমার কুসংস্কার থাকা ঠিক নয়, কিন্তু তখন আমি কীভাবে জানি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, যত কঠিনই হোক এই অপারেশান দিয়ে ছেলেটার প্রাণ বেঁচে যাবে।

পরদিন ছেলেটার সার্জারি হল—দীর্ঘ সার্জারি—প্রায় ছয় ঘণ্টার মতো লাগল। অপারেশান থিয়েটার থেকে যখন বের হলাম আমরা এত ক্লান্ত যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, কিন্তু সবাই খুব খুশি। চমৎকারভাবে সার্জারি শেষ হয়েছে, ছেলেটা বেঁচে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

সত্যিই ছেলেটা বেঁচে গেল। সপ্তাহ দুয়েক পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে গেল। ঘটনাটায় আমার হয়তো খুশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি কেন জানি খুশি হতে পারলাম না। নিজেকে কেমন জানি একটা প্রতারক প্রতারক মনে হতে লাগল। যদি দেখতে পেতাম শকসোটা মাথা নেড়ে বলছে ছেলেটা বাঁচবে না, তা হলে কি আমি তার জন্যে এত শক্তি ব্যয় করতাম, নাকি দায়সারাভাবে কিছু-একটা করতাম?

ব্যাপারটা পরীক্ষা করার সুযোগ এসে গেল দুদিন পরেই। একজন রোগী অপারেশনের জন্যে অপেক্ষা করছে। জটিল অপারেশান, কিন্তু আমি আগে অনেক করেছি। সত্যি কথা বলতে কী, ঢাকা শহরে এই বিশেষ অপারেশনটির জন্যে আমার খানিকটা খ্যাতি আছে। ক্যাবিনে যখন কেউ নেই আমি রোগীটার হাত ধরে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তেই শরীরের ভিতরে একটা কম্পন অনুভব করলাম, মনে হল সত্যি সত্যি কিছু-একটা শরীরের ভিতরে নড়ছে, হাত বেয়ে সেটা আমার নখের তলায় হাজির হল। কুৎসিত প্রাণীটা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ডান থেকে বামে মাথা নাড়ল। শকসোটা মনে করে রোগীটা বাঁচবে না।

==========

আমার কেন জানি রোখ চেপে গেল, মনেমনে ঠিক করলাম যেভাবেই হোক একে বাঁচাতেই হবে। আমি রোগীর যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যতটুকু সম্ভব প্রস্তুত হয়ে অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে গেলাম। দীর্ঘদিন থেকে সার্জারি করছি, হাতে চাকু ধরামাত্রই নিজের ভিতরে কেমন জানি একটা আত্মবিশ্বাস অনুভব করি, আজকেও তার ব্যতিক্রম হল না। জুনিয়র ডাক্তাররা মোটামুটি প্রস্তুত করে সরে গেছে, আমি কাজ শুরু করেছি, হঠাৎ একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, আমার মনে হল আমার বুড়ো আঙুলটা যেন জীবন্ত হয়ে গেছে—তার উপর যেন আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ফোরসেপ দিয়ে ধরে যেই চাকু নামাতে যাই চাকুটা নড়ে যায়—কিছুতেই ঠিক জায়গায় বসাতে পারি না। জোর করে চেষ্টা করতেই হঠাৎ করে একটা বড় আর্টারি কেটে ফেললাম—গলগল করে রক্ত বের হয়ে এল। বলা যেতে পারে আমার জীবনে এর থেকে বড় দুঃসময় আর কখনো আসে নি।

আমি নিজে অপারেশন চালিয়ে যেতে পারলাম না, জুনিয়র ডাক্তাররা জোড়াতালি দিয়ে কোনোভাবে শেষ করল। আমি পুরোপুরি পরাজিত একজন মানুষের মতো ফিরে এলাম। রোগীটি যে ভোর হবার আগেই মারা যাবে সে-ব্যাপারে আমার নিজের কোনো সন্দেহ ছিল না।

বাসায় এসে আমি অন্ধকার বারান্দায় মুখ ঢেকে বসে আছি, তখন আমার স্ত্রী এসে আমার কাছে বসল। নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

আমি তখন খুব দুর্বল হয়ে আছি, পুরো ব্যাপারটা আমার উপরে এত ভয়ংকর চাপ সৃষ্টি করেছে যে সেটা আর নিজে নিজে সহ্য করতে পারছি না। আমি ঠিক করলাম আমার স্ত্রীকে সব খুলে বলতে হবে, কারও সাথে এই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণাটা ভাগাভাগি করে নিতে হবে।

আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, "আমি তোমাকে আজ একটা কথা বলব। আমি ব্যাপারটা তোমার কাছ থেকে অনেকদিন গোপন রেখেছি।"

আমার কথা শুনে আমার স্ত্রী খুব অবাক হল না, নিচু গলায় বলল, "আমিও তোমাকে একটা কথা বলব যেটা আমি তোমার কাছ থেকে গোপন রেখেছি।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কী কথা?"

"আগে তোমারটা বলো।"

আমি কিছু-একটা বলতে চাইছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী শান্ত চোখে বলল, "তুমি, আগে বলো। প্লীজ!"

আমি তখন একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে তাকে আমার গত কয়েকদিনের কথা বলতে শুরু করলাম। কেমন করে ব্যাপারটা শুরু হল, কেমন করে

==========

সত্যি সত্যি বুড়ো আঙুলের নিচে কদর্য একটা মুখ ভেসে আসতে শুরু করল, কেমন করে সেটা মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করল, কেমন করে আমাকে অপারেশান টেবিলে পুরোপুরি অকর্মণ্য করে তুলল, আমি কিছুই গোপন করলাম না।

সবকিছু শুনে আমার স্ত্রী হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি এটা বিশ্বাস কর?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আমি বিশ্বাস করতে চাই না, কিন্তু তুমিই বলো আমি কেমন করে অবিশ্বাস করি?"

আমার স্ত্রী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ভালোই হল।"

"কী ভালোই হল?"

"তুমি বলে দিতে পারবে আমি বাঁচব কি বাঁচব না।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কী বলছ তুমি?"

"আমি খুব অসুস্থ।"

"কী হয়েছে তোমার?"

"লিউকিমিয়া।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কী বলছ তুমি!"

"হ্যাঁ। আমি অনেকদিন থেকে পরীক্ষা করাচ্ছি। ব্লাড স্যাম্পল সিংগাপুর থেকে পরীক্ষা করিয়ে আনা হয়েছে। পজিটিভ।"

"আমাকে—আমাকে—তুমি এতদিন বলনি কেন?"

আমার স্ত্রী হাসার চেষ্টা করে বলল, "এই তো বললাম। আগে থেকে বললে তুমি আগে থেকে দুশ্চিন্তা করতে।"

"কিন্তু, কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

আমি কিছু না বলে হতবাক হয়ে আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার স্ত্রী আমার গায়ে হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলল, "তুমি জান এই লিউকিমিয়ার চিকিৎসা কী। কিমো থেরাপি। বড় কষ্ট এই চিকিৎসায় আমি জানি। যদি আমি বাঁচব না তা হলে এই কষ্টের ভিতর দিয়ে আমি যেতে চাই না। জীবনের শেষ কয়টা দিন আমি একটু শান্তিতে কাটাতে চাই।"

আমি বিস্ফারিত চোখে আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। সোজা হয়ে বসে বললাম, "কী বলছ তুমি এসব?"

"ঠিকই বলছি।" আমার স্ত্রী তার হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও। আমাকে ধরো। ধরে তুমি তোমার আচাতন কুচাতন মন্ত্রটা বলো।"

==========

"না।"

"তোমাকে বলতে হবে।"

"না, কিছুতেই না।" আমি চিৎকার করে বললাম, "কিছুতেই না। আমি এসব বিশ্বাস করি না।"

"আমি করি।" আমার স্ত্রী আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, "অবুঝ হয়ো না। প্লীজ। বলো, আমি বাঁচব কি বাঁচব না।"

গল্পের ঠিক এই পর্যায়ে এয়ারপোর্টের পেজিং সিস্টেমে ঘোষণা দেওয়া হল সিলেটগামী প্যাসেঞ্জাররা যেন ডিপারচার লাউঞ্জে এসে হাজির হয়। প্লেনটা এক্ষুনি ছাড়বে। ডাক্তার মাহবুব খন্দকার গল্প থামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমিও ব্যাগ নিয়ে উঠে দাড়ালাম, জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?"

"তারপর দেখতেই পাচ্ছেন। ওয়াইফকে একটু বুঝিয়ে বাথরুমে গেলাম। হ্যাক স ছিল, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে বুড়ো আঙুলটা কেটে ফেললাম।"

আমি শিউরে উঠে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোক ব্যাগটা হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। আমি পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, "আপনার স্ত্রী?"

"সে ভালো আছে। পারফেক্ট। ফিট অ্যাজ এ ফিডল। লিউকিমিয়ার চমৎকার চিকিৎসা বের হয়েছে।" ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে সহৃদয় ভঙ্গিতে হাসলেন।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলাম, "আমার একটা প্রশ্ন রয়ে গেছে।"

"বলুন।"

"যখন আপনি বুড়ো আঙুলটা কাটলেন তখন শকসোটা কোথায় ছিল? কী হল সেটার?"

ডাক্তার মাহবুব আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, "সেটা আরেক কাহিনী। বিমানমন্ত্রীর আরেক শালীর বিয়ে না হলে সেটা বলে শেষ করা যাবে না।"

==========

ফ্রাণী

"ফ্রাণী কাহাকে বলে?" জলীল স্যার ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা উচ্চারণ করে ক্লাসের দিকে তাকালেন।

টিটু মনেমনে বলল, "উচ্চারণটা হচ্ছে প্রাণী। ফ্রাণী না।" কিন্তু মুখে কোনো শব্দ করল না। জলীল স্যারকে উচ্চারণ শেখালে বিপদ আছে।

স্যার এক পা এগিয়ে এসে বললেন, "বল ফ্রাণী কাহাকে বলে?"

এবারে আজমল হাত তুলল এবং সাথে সাথে জলীর স্যারের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হল। আজমল হচ্ছে ক্লাসের অন্যতম ভালো ছেলে। তার চুল ছোট করে ছাঁটা থাকে, তেল দিয়ে পরিপাটি করে সেই ছোট ছোট চুল ভিজিয়ে আঁচড়ানো থাকে। তার শার্ট নিখুঁতভাবে প্যান্টের মাঝে গুঁজে দেওয়া থাকে, সব বই এবং খাতায় মলাট লাগানো থাকে। সে ছোটাছুটি করে না, মারপিট করে না, ক্লাসে যেটা পড়ানো হবে সেটা তার আগে থেকে পড়া থাকে। স্যার কিংবা আপারা জিজ্ঞেস করলে সে সবার আগে হাত তুলে তার উত্তর দেয়।

জলীল স্যার আজমলের দিকে তাকিয়ে গলায় মধু ঢেলে বললেন, "বল আজমল।"

আজমল দাঁড়িয়ে মুখস্থ বলার মতো বলল, "পৃথিবীর সকল কিছুকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—জড়বস্তু এবং প্রাণী। পাথর ও বৃষ্টি জড়বস্তু। বিড়াল ও বটবৃক্ষ প্রাণী। জড়বস্তু নড়াচড়া করিতে পারে না এবং তাহাদের সংবেদনশীল স্নায়ু নাই। কিন্তু প্রাণী নড়াচড়া করিতে পারে, তাহাদের . . . ."

টিটু তাদের জীববিজ্ঞান বই খুলে দেখল, আজমল একেবারে পুরো চ্যাপ্টার মুখস্থ করে এসেছে, দাঁড়ি-কমাসহ! পাঠ্যবইয়ের ভাষা কিছু বোঝা

==========

যায় না, তার উপর আজমল যেভাবে রেলগাড়ির মতন গড়গড় করে মুখস্থ বলে যাচ্ছে, কী বলছে তার কিছুই বোঝা গেল না, শুধু মুখস্থটা যে খুব ভালো হয়েছে সেটা বোঝা গেল। জলীল স্যার শুনে খুব খুশি হলেন, দাঁত বের করে হেসে বললেন, "বেরি গুড।"

টিটু দাঁতের ফাঁক দিয়ে নিশ্বাস নিয়ে মনেমনে বলল, "বেরি গুড না— ভেরি গুড।"

জলীল স্যার এবারে আজমলকে ছেড়ে বাকি ক্লাসের দিকে নজর দিলেন এবং প্রায় সাথে সাথেই তাঁর মুখ থেকে হাসি সরে গিয়ে সেটা শক্ত হয়ে গেল, দেখে মনে হতে লাগল স্যার বুঝি একক্লাস গোরু-ছাগলের দিকে তাকিয়ে আছেন। নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "বুঝেছিস ফ্রাণী কাহাকে বলে?"

ক্লাসের সবাই মাথা নাড়ল। প্রাণী হচ্ছে বইয়ের চোদ্দ পৃষ্ঠায় লেখা কিছু কথা, বাসায় গিয়ে সেটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে, এর মাঝে না বোঝার কী আছে? জলীল স্যারকে দেখে অবশ্য মনে হল তাঁর বুঝি পড়ানোর মুড এসেছে। মুখটা ছুঁচালো করে বললেন, "যারা বুঝিস নাই তারা মন দিয়ে শোন। ফ্রাণী কী? জড় ফদার্থ এবং ফ্রাণীর মধ্যে ফার্থক্য কী?"

টিটু নিশ্বাস আটকে দাঁতের মাঝে দাঁত চেপে মনেমনে বলল, "ফদার্থ না, পদার্থ। ফার্থক্য না, পার্থক্য।"

জলীল স্যার বলতে লাগলেন, "ফ্রাণীর ফ্রথম বৈশিষ্ট্য তাদের খেতে হয়। তাদের নিশ্বাস নিতে হয়। তারা বর্জ্য ফদার্থ ত্যাগ করে। তাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তারা লড়াচড়া করতে পারে। জড় ফদার্থ লড়াচড়া করে না, শুধু জীবন্ত ফ্রাণী লড়াচড়া করে।"

টিটু এবারে হাত তুলল, বলল, "স্যার।"

সাথে সাথে জলীল স্যারের মুখ শক্ত হয়ে গেল, ক্লাসে খালি প্রশ্ন করে বলে টিটুকে জলীল স্যার দুই চোখে দেখতে পারেন না। মুখ শক্ত করেই বললেন, "কী?"

"স্যার, মোটরগাড়ি চালাতে পেট্রল লাগে, ইঞ্জিনে অক্সিজেন লাগে। বর্জ্য হিসেবে কালো ধোঁয়া বের হয়। তা হলে কি মোটরগাড়ি একটা প্রাণী?"

কথাটা টিটু মোটেই ঠাট্টা করে বলে নি, একটা যুক্তি দিয়ে বলেছে, কিন্তু ক্লাসের সবাই হাহা করে হেসে উঠল। জলীল স্যার সেটাকে একটা ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে ধরে নিলেন। স্যারের কালো মুখ আরও কালো এবং থমথমে হয়ে উঠল। স্যার ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে এগিয়ে

এসে খপ করে টিটুর কান ধরে তাকে বেঞ্চ থেকে টেনে তুলে ফেললেন, মুখ ছুঁচালো করে বললেন, "মাথায় এইটুকু বুদ্ধি? গাড়ি একটা প্রাণী?"

"না স্যার, কিন্তু প্রাণীরা যা যা করতে পারে গাড়িও তো তা-ই করতে পারে।"

জলীল স্যার টিটুর কান ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "প্রাণীদের আরও বৈশিষ্ট্য আছে গাধা কোথাকার! প্রাণীরা বড় হয় আর বাচ্চা জন্ম দেয়।"

টিটু মনে মনে বলল, "জন্ম না, পয়দা।" বাচ্চা পয়দা করা আর বড় হওয়া নিয়েও তার কিছু বক্তব্য ছিল, কিন্তু জলীল স্যার যখন শক্ত হাতে কান ধরে রেখেছেন তখন সেটা নিয়ে কথা বলা বিপজ্জনক হতে পারে। কাজেই টিটু কানের যন্ত্রণাটা সহ্য করে চুপ করে রইল। স্যার আবার কানে ধরে একটা হ্যাঁচকা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "গাড়ি কি কখনো বড় হয়? দেখেছিস কখনো একটা টেম্পো বড় হয়ে ট্রাক হয়েছে? দেখেছিস?"

টিটু মাথা নেড়ে বলল যে সে দেখে নি।

"কখনো দেখেছিস একটা বাস একটা বেবিট্যাক্সি বাচ্চা দিয়েছে? দেখেছিস?"

টিটুকে স্বীকার করতেই হল যে সেটাও সে দেখে নি। জলীল স্যার এবারে যুদ্ধজয় করার ভঙ্গি করে আস্তে আস্তে ক্লাসের সামনের দিকে চলে গেলেন। টিটু যখন দেখল তার থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে এবং আচমকা তাকে মেরে বসতে পারবেন না তখন আবার সাহস করে বলল, "স্যার।"

"আবার কী হল?"

"যদি কখনো দেখা যায় কোনোকিছু নড়াচড়া করতে পারে, সেটাকে খাবার থেকে শক্তি নিতে হয়, বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে, বড় হতে পারে, আবার নিজের মতো হুবহু আরেকটা জিনিস তৈরি করতে পারে তা হলে কি সেটাকে প্রাণী বলা যাবে?"

জলীল স্যার চোখ ছোট ছোট করে টিটুর দিকে তাকিয়ে থেকে আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন তার মতলবটা কী, কোনো-একটা যুক্তি দিয়ে আবার তাকে বিপদে ফেলে দেবে কি না। যখন মনে হল এই মুহূর্তে সেরকম কিছু করতে পারবে না, তখন একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "হ্যাঁ, বলা যাবে সেটা প্রাণী।"

টিটু সাথে সাথে বসে পড়ল দেখে জলীল স্যার নিশ্চিন্ত হলেন এবং গলা উঁচিয়ে বললেন, "লেখাপড়ার উদ্দেশ্য হল ভালো নম্বর পাওয়া। বইয়ে যা

==========

আছে মুখস্থ করে হুবহু লিখবি, সেটা নিয়ে কখনো তর্ক করবি না। যারা বই লিখেছে তারা কি না জেনেশুনে বই লেখে?"

টিটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনেমনে বলল, "ফড়াশোনার উদ্দেশ্য নম্বর ফাওয়া না—পড়াশোনার উদ্দেশ্য শেখা।" কিন্তু সেটা সে জোর গলায় বলতে পারল না, এই স্কুলে কেউ এই কথা জোর দিয়ে বলতে পারে না।

পরের দিন বিজ্ঞান ক্লাসে জলীল স্যার এলেন না, দপ্তরি দিয়ে একটা নোটিশ পাঠালেন। নোটিশে লেখা জরুরি কাজে তিনি ক্লাসে আসতে পারছেন না, সবাই যেন বিজ্ঞান বইয়ের উনত্রিশ পৃষ্ঠা থেকে সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠা মুখস্থ করে ফেলে। আজমলের উপর নির্দেশ থাকল ক্লাসের উপর নজর রাখা, কেউ যদি গোলমাল করে তা হলে তার নাম লিখে রাখা, স্যার পরের ক্লাসে তাদের এমন ধোলাই দেবেন যে তারা তাদের বাবার নাম না হলেও মামা-চাচাদের নাম ভুলে যাবে। সবাই যখন উনত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে লাগল তখন আজমল একটা কাগজ আর কলম নিয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রইল, কেউ একটু মুখ খুললেই তার নাম উঠে যাবে। আজমল এমনিতেই স্যারদের কথা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলে, এসব ব্যাপারে শুধু অক্ষরে-অক্ষরে নয়, দাঁড়ি-কমাসহ মেনে চলে—কাজেই কেউ টুঁ শব্দ করার সাহস পেল না।

জলীল স্যার কেন ক্লাসে এলেন না বোঝা গেল না, কিন্তু দেখা গেল স্কুলের বাইরে একটা পিকআপ ট্রাক এসে থেমেছে, তার ভেতর থেকে কার্ডবোর্ডের বড় বড় বাক্স নামানো হচ্ছে। জলীল স্যারকে দেখা গেল খুব ব্যস্ততার ভান করে হাঁটাহাঁটি করছেন। বাক্সগুলি যখন ধরাধরি করে নেওয়া হচ্ছে তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে জলীল স্যার এমন ভাব করতে লাগলেন যেন বাক্সগুলির ভিতরে ছোট ছোট অ্যাটমবোমা রয়েছে, একটু ধাক্কা লাগলেই সেগুলি ফেটে যাবে।

পরদিন বাক্সগুলির রহস্যভেদ হল। জলীল স্যার ক্লাসে এসে এমন ভাব করতে লাগলেন যে মনে হল তাঁকে বুঝি ভোট দিয়ে দেশের প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছে—এক্ষুনি তাঁকে বঙ্গভবনে চলে যেতে হবে। মুখটা ছুঁচালো করে ক্লাসের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "বিজ্ঞান শিক্ষা কখনই ফূর্ণাঙ্গ হয় না যদি সেটা হাতে-কলমে করা না যায়। (টিটু দাঁতে দাঁত ঘষে মনেমনে বলল, ফূর্ণাঙ্গ না, পূর্ণাঙ্গ!) এই আধুনিক যুগে কম্পিউটারের শিক্ষা না দেওয়া হলে সেই শিক্ষা হবে অফর্যাপ্ত (আবার দাঁতে